দস্যু বনহুর
নাগরিক দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো বনহুর—রাণী দুর্গেশ্বরী তুমি! হঠাৎ বনহুর হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে। সে হাসির প্রতিধ্বনি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো গোটা পোড়োবাড়ির কন্দরে কন্দরে। হাসি থামিয়ে বললো বনহুর— আমি জানতাম তুমি মরোনি।

দুর্গেশ্বরী নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো। বনহুরের দিকে চোখ তুলে তাকাবার মত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে তার গণ্ডদ্বয়।

বনহুর বললো আবার— যেদিন শুনলাম রাজা তোমার অনুরোধে তোমারই নির্দিষ্ট স্থানে তোমাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করেছেন তখনই বুঝেছিলাম সবকিছু। আজ তুমি মহারাণী দুর্গেশ্বরী নও, তাই তোমাকে তুমি বলে সম্বোধন করলাম, নিশ্চয়ই মনে কিছু করোনি।

এবার রাণী দুর্গেশ্বরী চোখ তুলে তাকালো বনহুরের দিকে, কিন্তু কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর লক্ষ্য করলো, সেদিন রাণী দুর্গেশ্বরীর দৃষ্টির মধ্যে ছিলো এক উগ্রভাব, আজ সেখানে কোমল এক নারীসুলভ চাহনি পরিলক্ষিত হলো। বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই দৃষ্টি নত করে নিলো রাণী দুর্গেশ্বরী।

বনহুর রুক্ষ-কঠিন স্বরে তিরস্কার করবে ভেবেছিলো কিন্তু রাণী দুর্গেশ্বরীর চাহনি তার মনকে নরম করে আনলো, তবু গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর— আমি জানতে চাই, এ ছবি তুমি কেন এঁকেছো? কোন্ অধিকারে তুমি আমার ছবি এঁকেছো বলো? জবাব দাও?

দুর্গেশ্বরী সম্পূর্ণ নীরব।

বনহুর বললো—জবাব না দিলে আমি এক্ষুণি এ ছবি নষ্ট করে ফেলবো।

দুর্গেশ্বরী সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের পায়ের কাছে বসে পড়ে তার পা দু'খানা চেপে ধরলো হাত দু'খানা দিয়ে— তুমি আমাকে হত্যা করো বনহুর, তবুও ছবি তুমি নষ্ট করো না। আমার সারা জীবনের সাধনা ঐ ছবি.....উঠে

দাঁড়ালো দুর্গেশ্বরী, বস্ত্রমধ্য হতে বের করে আনলো একখানা ছোরা, বাড়িয়ে ধরলো বনহুরের দিকে—নাও, আমাকে হত্যা করো......

বনহুর নির্বাক বিস্ময়ে তাকালো দুর্গেশ্বরীর দিকে, আজ এক নতুন রূপ ধরা পড়লো বনহুরের চোখে। সেই উগ্র নারীমূর্তির অন্তরালে এমন একটা কোমল রূপ লুকিয়ে ছিলো. ভাবতে পারে না বনহুর। এই মুহূর্তে ওর হাতের ছোরাখানা নিয়ে ওকে হত্যা করতে পারে কিন্তু নারীহত্যা করা বনহুরের স্বভাব নয়। তাছাড়া দুর্গেশ্বরী এই দন্ডে তার কাছে অপরাধিনী নয় বরং সে ক্ষমাপ্রার্থিনী।

বনহুর দুর্গেশ্বরীর হাত থেকে ছোরাখানা কেড়ে নিলো, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো—তোমার মত পিশাচিনী পাপময়ী নারীকে হত্যা করে আমার হাত কলুষিত করতে চাই না। আমি জানতে চাই.....

বাধা দিয়ে বলে উঠলো দুর্গেশ্বরী—না না, তুমি আমার কাছে জানতে চেওনা কেন আমি এ ছবি এঁকেছি।

তোমাকে বলতে হবে, কোন্ অধিকারে তুমি আমার প্রতিচ্ছবি আঁকলে?

দুর্গেশ্বরীর মুখমন্ডল ব্যথাকাতর হয়ে উঠলো, বললো সে—আমার অন্তরের আহ্বানে আমি এ ছবি এঁকেছি। আর অধিকার পেয়েছি আমার মনের কাছে......

তোমার এতোটুকু লজ্জাবোধ থাকলে তুমি কোনোদিন এ কাজ করতে পারতে না।

বলো, যত খুশি তত বলো বনহুর, আমি সব সহ্য করবো। তবু একটি অনুরোধ আমার— তোমাকে ভালোবাসার অধিকার থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না। তোমার স্মৃতিই যে আমার জীবনের সম্বল।

একটা ব্যঙ্গপূর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে, বললো—এমনি আরও কত পুরুষের স্মৃতি তুমি মনের গহনে এঁকে রেখেছো সুন্দরী?

বিশ্বাস করো, কারো স্মৃতিই আমার মনের পর্দায় রেখাপাত করতে পারেনি আজও, এমন কি আমার স্বামী মহারাজের স্মৃতিও নয়। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মনে একমাত্র তুমিই আসন গেড়ে নিয়েছো। জানি না তুমি আমাকে কোনো যাদু করেছো কিনা। কেন আমি তোমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না। জানি না, জানি না কেন....

বনহুরের মনে একটা সহানুভূতির সুর জেগে উঠে, বলে—দুর্গেশ্বরী, তুমি জানো না আমাকে ভালবেসে তুমি নিজের কাছে নিজেই বঞ্চিত হয়েছো।

না, আমি বঞ্চিত হইনি, হবোও না কোনোদিন।

তুমি উম্মাদ হয়ে গেছো দুর্গেশ্বরী।

না, উম্মাদ আমি হইনি......

তাহলে এমন কথা তুমি বলতে পারতে না। কোনোদিন তুমি আমাকে পাবে না দুর্গেশ্বরী।

তোমার রক্তে-মাংসে গড়া দেহটা না পেতে পারি কিন্তু তোমার চিন্তা থেকে আমাকে কোনোদিন বঞ্চিত করতে পারবে না। তোমার স্মৃতির পরশ আমাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে।

আবার বনহুর হেসে উঠে অদ্ভুতভাবে—হাঃ হাঃ হাঃ, স্মৃতির পরশ...চমৎকার, চমৎকার নারী তুমি! নারীরত্ন তুমি! একজনের স্মৃতি আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চাও?

হাঁ বনহুর, তোমার স্মৃতি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে অনন্তকাল ধরে। তুমি শুধু তোমার ছবিখানাকে পূজা করার অধিকার আমাকে দাও।

বিস্ময়ে ভ্রু জোড়া কুঁচকে উঠলো বনহুরের, বললো—পূজা?

হাঁ, পূজা....

বনহুর স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন, বলে কি দুর্গেশ্বরী! তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো সে ওর মুখের দিকে। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বললো—বেশ, তাতেই যদি তুমি তৃপ্তি পাও, করো।

দুর্গেশ্বরী পুনরায় বসে পড়লো বনহুরের পায়ের কাছে, আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠলো—বনহুর! বনহুর...

বনহুর দুর্গেশ্বরীর হাত দু'খানা ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো, শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমি তোমাকে যা বলবো তাই করতে হবে।

আদেশ করো? যা বলবে তাই করবো আমি।

প্রথম কথা হলো, আমার তিনজন লোক তোমার অনুচরদের হাতে বন্দী হয়েছে— তাদের মুক্তি দিতে হবে।

বেশ, তাই দেবো।

আর তোমাকে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে।

আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম।

আমাকে স্পর্শ করে শপথ করতে হবে।

দুর্গেশ্বরী বনহুরের পা দু'খানা দু'হাতে চেপে ধরে বললো—আমি তোমাকে স্পর্শ করে শপথ করলাম, এখন হতে সৎপথে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলাম। নিজকে আমি বিলিয়ে দেবো পরের উপকারের জন্য....

আজ আমি সন্তুষ্ট হলাম দুর্গেশ্বরী। চলো, এবার আমার বন্দীদের মুক্তি দেবে চলো।

চলো বনহুর....দুর্গেশ্বরী আঁচলে অশ্রু মুছে উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে চললো পাতালপুরীর গোপন পথ ধরে।

বনহুর দুর্গেশ্বরীর সঙ্গে এগুতে এগুতে লক্ষ্য করলো, সত্যি বিস্ময়কর এ পথ— ভূগর্ভে তার যে আস্তানা রয়েছে তার চেয়েও দুর্গম কঠিন এ পথ।

নির্জন অপরিসর আঁধো অন্ধকার গলিপথ। শক্ত পাথর কেটে এ পথ তৈরি করা হয়েছে। অন্ততঃপক্ষে পৃথিবী হতে চল্লিশ ফুট মাটির তলায় এ দুর্গম সঙ্কীর্ণ পথটি, সেই পথে এগিয়ে চলেছে দুর্গেশ্বরী আর দস্যু বনহুর।

অনেক পথ এগিয়ে এলো তারা।

বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো—আমায় তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

থমকে দাঁড়ালো দুর্গেশ্বরী, এখনও তার দেহে সেই শুভ্র ড্রেস শোভা পাচ্ছে। নত দৃষ্টি তুলে বললো—তোমার আমি কোনো ক্ষতি করবো না বনহুর। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।

বনহুর বললো—বিশ্বাস না করলে এতোক্ষণ তোমাকে আমি হত্যা করতাম, বুঝলে?

আমিও তোমাকে হত্যা করতে পারতাম বনহুর।

কিন্তু আমি জানি, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না।

কারণ?

তুমি আমাকে ভালবাসো।

বনহুর, তোমার মুখে এই কথাটা শোনবার জন্য আমি এতোদিন প্রতীক্ষা করেছি। আমি তোমায় ভালবাসি বনহুর....দুর্গেশ্বরী বনহুরের হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরলো।

নির্জন নিভৃত গলিপথে বনহুর যুবক আর রাণী দুর্গেশ্বরী যুবতী— উভয়ের পক্ষেই নিজ নিজকে সংযত রাখা কঠিন। কিন্তু বনহুর কঠিনপ্রাণ পুরুষ, দুর্গেশ্বরীর আবেগ-বিহ্বল আচরণে সে এতোটুকু বিচলিত বা অসংযত হলো না, বললো সে— তুমি আমায় ভালবাসো বিশ্বাস করবো যদি তোমার শপথ রক্ষা করো।

হাঁ বনহুর, আমি আমার শপথ রক্ষা করবো।

চলো।

চলো বনহুর।

এ পথে তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো দুর্গেশ্বরী?

আমার সারা জীবন সঞ্চিত রত্নভান্ডারে।

তার মানে, আমাকে তুমি মোহগ্রস্ত করতে চাও?

না।

তবে রত্নভান্ডারে কেন?

পরে সব বলবো চলো।

বনহুরের মনে দারুণ বিস্ময় জাগে। কোনো কথা না বলে অনুসরণ করে দুর্গেশ্বরীকে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা বিরাট গুহামুখের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো দুর্গেশ্বরী, পাশের দেয়ালে চাপ দিতেই খুলে গেলো পাথরের দরজা। বেরিয়ে এলো একটা সুড়ঙ্গমুখ।

বনহুর কিছু বলতে যচ্ছিলো, দুর্গেশ্বরী বললো— এসো।

দুর্গেশ্বরী প্রবেশ করলো সুড়ঙ্গমধ্যে।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো সে। সুড়ঙ্গমধ্যে পাথরের দু'পাশে অসংখ্য মনিমুক্তাখচিত রৌপ্য-সিন্দুক থরে থরে সাজানো।

দুর্গেশ্বরী বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো এবার— বনহুর, এই যে সব মনিমুক্তাখচিত রৌপ্য-সিন্দুক দেখছো, এতে আছে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। আমি লক্ষ লক্ষ অসহায়ের বুকের রক্তে এসব মুদ্রা/সঞ্চয় করেছি। রক্তের নেশায় একদিন আমি মেতে উঠতাম। হত্যায় পেতাম আমি আনন্দ, নিজ হস্তে শত শত লোকের মস্তক আমি ছিন্ন করেছি।

দুর্গেশ্বরীর কথাগুলো নির্জন সুড়ঙ্গমধ্যে বড় অদ্ভুত শোনাতে লাগলো, কেমন যেন ভাবগম্ভীর থমথমে সে কণ্ঠস্বর। দস্যু বনহুর নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে দুর্গেশ্বরীর মুখে।

দুর্গেশ্বরী বলে চলেছে— মায়াহীন নির্মম ছিলো আমার প্রাণ। এসো বনহুর, আমার সেদিনের কীর্তি তুমি দেখবে চলো।

বনহুর দুর্গেশ্বরীর সঙ্গে পা বাড়ালো, কিছু পথ অগ্রসর হবার পর একটা গুহার সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। গভীর মাটির নিচে এমন সুড়ঙ্গপথ আর পাথরের তৈরি গুহা অত্যন্ত আশ্চর্য। বনহুরও দাঁড়িয়ে পড়লো ওর পাশে।

দুর্গেশ্বরী দেয়ালে চাপ দিতেই খুলে গেলো গুহার কপাট। সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের চোখ দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেলো, দেখলো গুহার মধ্যে অসংখ্য নরকঙ্কাল স্তূপাকার হয়ে আছে।

দুর্গেশ্বরী বললো— এই যে নরকঙ্কাল দেখছো, এসব আমারই পাপের জ্বলন্ত প্রমাণ। সবগুলো লোককে আমি হত্যা করেছি বনহুর। সেকি নির্মম নিদারুণ করুণ হত্যা...গলা ধরে আসে দুর্গেশ্বরীর।

বনহুর সহসা কোনো কথা বলতে পারলো না। সে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেছে, জীবনে সে বহু নরহত্যা দেখেছে কিন্তু এমন দৃশ্য সে কমই দেখেছে। নারী হয়ে এমন নরহত্যাকারী সে কোনোদিন দেখেনি। একবার মনে হলো, এই মুহূর্তে দুর্গেশ্বরীকে চরম শিক্ষা দেয়, কিন্তু সামলে নিলো বনহুর নিজকে। কারণ সে নিজে তার দোষ মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছে।

দুর্গেশ্বরী বললো আবার— এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করতে চাই বনহুর। আমার সারা জীবনের সঞ্চয় তুমি গ্রহণ করে আমাকে মুক্তি দাও।

এতক্ষণে বনহুর যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। চমকে উঠে সে দুর্গেশ্বরীর কথায়, ভ্রূজোড়া টান করে বলে—কি বললে রাণী?

না না, রাণী, তুমি আমাকে অন্য নামে ডাকো।

দুর্গেশ্বরী....

না, দুর্গেশ্বরী মরে গেছে, তুমি একটা নাম আমার বেছে দাও। যে নাম ধরে ডাকলে আমার মন হালকা হবে।

বেশ, আমি তোমার নাম দিলাম, আজ থেকে নরপিশাচিনী দুর্গেশ্বরী নাম মুছে তোমার নাম হলো দেবরাণী!

দুর্গেশ্বরীর চোখ দুটো আনন্দে জ্বলে উঠলো, দীপ্ত হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল।

বনহুর লক্ষ্য করলো দুর্গেশ্বরীর মুখোভাব, সেও খুশি হলো মনে মনে, বললো— তোমার এ সম্পদ তোমারই রইলো, তুমি পৃথিবীর শত শত অসহায় জনগণের মঙ্গলার্থে এসব বিলিয়ে দিতে পারো।

তুমি যাতে সুখী হও আমি তাই করবো বনহুর।

বেশ, তাই করো।

আমাকে কথা দাও, যখন আমি তোমায় স্মরণ করবো তখনই তুমি আমার ডাকে সাড়া দেবে?

হেসে বললো বনহুর— দেবো।

সত্যি কথা দিলে?

দিলাম।

চলো, এবার তোমার সঙ্গীদের মুক্ত করে দিয়ে আসি।

চলো।

বনহুর আর দুর্গেশ্বরী ফিরে এলো পূর্বের সেই কক্ষে, যে কক্ষে বনহুরের প্রতিচ্ছবিখানা পুষ্পশোভিত স্বর্ণমঞ্চে রক্ষিত ছিলো। সম্মুখের ধুপদানী থেকে তখনও ধুম্ররাশি নির্গত হচ্ছিলো। কক্ষটা এ মায়াময় পরিবেশে আকৃষ্ট ছিলো। বনহুর ক্ষণিকের জন্য মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলো তার নিজের ছবিখানার দিকে।

দুর্গেশ্বরী প্রণাম করলো বনহুরের পায়।

চমকে উঠলো বনহুর— একি করছো!

তোমাকে শেষবারের মত প্রণাম করলাম। দুর্গেশ্বরী উঠে দাঁড়ালো ধীরে ধীরে, বললো—তোমার দেওয়া নাম ধরে একবার ডাকো আমাকে। তোমার কণ্ঠে শুনতে চাই বনহুর আমার সেই নাম....

বনহুর দুর্গেশ্বরীর চিবুকটা উঁচু করে ধরে বললো— দেবরাণী, আজ থেকে তুমি সত্যিই দেবরাণী হয়েছো। দুর্গেশ্বরী মরে গেছে সম্পূর্ণভাবে।

অস্ফুট শব্দ করে উঠলো দুর্গেশ্বরী— বনহুর!

দেবরাণী, চলো এবার ....

ওরা দু'জনা একটা লিফটের মত আসনে উঠে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে আসনটা উপরে উঠতে লাগলো। অল্পক্ষণেই তারা সেই কক্ষে এসে দাঁড়ালো যে কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে রহমান, নূরী আর নাসরিনকে।

কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিলো, দুর্গেশ্বরীকে দেখামাত্র তারা অস্ত্র নিচু করে অভিবাদন জানালো।

দুর্গেশ্বরী বললো— বন্দীদের বন্ধন উন্মোচন করে দাও।

প্রহরিগণ দুর্গেশ্বরীর আদেশ পালন করলো।

নূরী মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকে— হুর... হুর ... আমার হুর...

দুর্গেশ্বরীর দু'চোখে প্রথমে বিস্ময় জাগলো, পর মুহূর্তে দৃষ্টি নত করে নিলো সে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক চিরে।

❑

গোরী রাজ্যের অদূরে পোড়োবাড়ির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফিরে আসে বনহুর সঙ্গে রহমান, নূরী ও নাসরিনকে নিয়ে। বনহুরের মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দ— দস্যুরাণী দুর্গেশ্বরী তার কু-কর্ম ত্যাগ করে নতুন জীবন লাভ করেছে। তার দ্বারা জনগণের আর কোনো অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা নেই।

বনহুর নিশ্চিন্ত মনে আস্তানায় বিশ্রাম করতে লাগলো। নিজ শয্যায় শয়ন করে ভাবছে গত কয়েক দিন আগের কথা। পোড়োবাড়ির গহ্বরে সেই অদ্ভুত রহস্যময় সুড়ঙ্গপথের কথা। সবচেয়ে বনহুরকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে দুর্গেশ্বরী হাতে আঁকা তার নিজের ছবিখানা। শুধু বিস্ময়ভরাই নয়, একেবারে অত্যাশ্চর্য— কি করে তাকে হুবহু বন্দী করেছে ক্যানভাসের বুকে। তারই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি!

বনহুর আপন মনে ভাবছিলো সেই কথা, এমন সময় বনহুরের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে নূরী। চুপি চুপি শয্যার পাশে এসে দাঁড়ায়, বিনুনী দিয়ে একটুখানি নাড়া দেয় বনহুরের চিবুকে।

চমকে উঠে বনহুর, ফিরে তাকাতেই খিলখিল করে হেসে উঠে নূরী, বলে সে—বড্ড চমকে দিয়েছি, দস্যুসম্রাট কি ভাবছিলে শুনি?

বনহুর বালিশটা টেনে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বললো—তোমার কথাই ভাবছিলাম নূরী।

আমার কথা?

হাঁ, তোমার কথা। ভাবছিলাম কি দুঃসাহস তোমার, রহমানের সঙ্গে কোন্ সাহসে তুমি আর নাসরিন গোরীর সেই পোড়োবাড়ি গিয়েছিলে?

তোমাকে খুঁজতে।

হেসে উঠে বনহুর অদ্ভুতভাবে, তারপর বলে—পেয়েছিলে আমাকে?

এই তো পেয়েছি। বললো নূরী।

বনহুর পূর্বের সুরেই বলে—না, তোমরা আমাকে পাওনি, আমি নিজেই এসেছি। আমি যদি না আসতাম, কোনোদিনই তোমরা আমাকে খুঁজে পেতে না।

নূরী এবার বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পড়লো, বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে বললো—সত্যি তোমাকে কোনোদিন আর খুঁজে পেতাম না আমরা, যদি তুমি ফিরে না আসতে। হুর, বলো ঐ মেয়েটি কে ছিলো তোমার সঙ্গে?

যার কথায় তোমরা মুক্তি পেলে?

হাঁ, সেই দেবীমূর্তি নারী....

তুমি যাকে দেবীমূর্তি বলছো, জানো না নূরী, সে কতবড় পিশাচিনী, কত ভয়ঙ্কর নারী!

এ তুমি কি বলছো হুর?

তুমি চুপ করে বসো, আমি তোমাকে ঐ দেবীমূর্তি সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলছি। অতি বিস্ময়কর নারী সে, ওর নাম রাণী দুর্গেশ্বরী...

শুনেছি দুর্গেশ্বরী গোরী রাজ্যের রাণী?

হাঁ, একদিন ছিলো কিন্তু আজ সে গোরী রাজ্যের রাণী নয়।

তবে কি সে?

এখন সে দেবরাণী...শোনো তার সম্বন্ধে বলছি।

বনহুর গোরী রাজ্যের মহারাজ এবং তার দুঃসাহসী রাণীর কীর্তিকলাপ সব বলে যায়, পোড়োবাড়ির সব কাহিনীও বলে সে নূরীর কাছে, তার ছবি খানার কথাও গোপন করে না বনহুর।

সব শুনে নূরী হতভম্ব বিস্মিত হয়। ঢোক গিলে বলে নূরী— রাণী দুর্গেশ্বরী তাহলে তোমাকেও বন্দী করে রেখেছে তার ভূগর্ভ কক্ষে, একদিন তোমাকে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে....

নূরীর কথায় একটা স্মিত হাসির আভাস ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে, বললো—ভক্তের ডাকে দেবতার সাড়া না দিয়ে উপায় কি বলো? যাক্ সে কথা, অনেকদিন ঝরণার পানিতে প্রাণ ভরে সাঁতার কাটা হয়নি— চলো নূরী, আজ এই জোছনাভরা রাতে আমরা ঝরণায় সাঁতার কাটবো।

বনহুরের কথায় নূরীর মন নেচে উঠলো যেন, সেও তো অনেক দিন ঝরণার পানিতে মন ভরে সাঁতার কাটতে পারেনি। সে পাহাড়ী মেয়ের মতই চঞ্চল, উচ্ছল মুখরা মেয়ে। জন্মাবার পর থেকেই বন-জঙ্গল , নদী-নালা-ঝরণার সঙ্গে তার প্রাণের সম্বন্ধ। বনের পশু-পাখী-জীবজন্তু ওর খেলার সাথী। দু'চার দিন যদি এদের ছেড়ে দূরে থাকে সে, তাহলেই হাঁপিয়ে উঠে। সব সময় ফাঁক খোঁজে কখন ছাড়া পাবে, ছুটে যাবে সে তার চিরসাথী বনানীর বুকে। খেলা করবে হরিণ আর হরিণীর সাথে। সাঁতার কাটবে রাজহংসীর পাশে পাশে।

নূরী বনহুরের হাত ধরে বলে—চলো তাহলে, আর বিলম্ব সইছে না।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো— চলো।

বনহুর আর নূরী আস্তানার বাইরে এসে দাঁড়ালো, তাজ আর দুলকী অপেক্ষা করছিলো।

বনহুর তাজের পিঠে বসলো, নূরী চেপে বসলো দুলকীর পিঠে।

অন্ধকার অশ্ব দুটি ছুটে চললো কান্দাই জঙ্গলের দক্ষিণ ঝরণার দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেলো ঝরণার পাশে।

জোছনাভরা পৃথিবী।

মুক্ত আকাশ।

ঝরণার সচ্ছ জলধারার বুকে জোছনার আলো পড়ে অপূর্ব এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে বনহুর নেমে নূরীকে নামিয়ে নিলো অশ্ব থেকে। ওর হাত ধরে এগিয়ে চললো ঝরণার দিকে।

নূরী নিজের হাতে বনহুরের জামার বোতাম খুলে দিলো।

তারপর ওরা দু'জনা ঝরণার সচ্ছ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, সাঁতার কেটে এগিয়ে চললো পাশাপাশি। নূরী বনহুরকে লক্ষ্য করে পানি ছিটিয়ে দিতে লাগল।

বনহুর ওকে ধরবার জন্য এগিয়ে আসতেই নূরী ঝরণার জলে ডুব দিলো।

জোছনার আলোতে বনহুর ওকে খুঁজতে লাগলো পানির মধ্যে।

নূরী ডুব দিয়ে বনহুরের পিছনে এসে ভেসে উঠলো, হেসে উঠলো সে খিলখিল করে।

বনহুর ওকে ধরে ফেললো খপ্ করে।

দু'জনার হাসির শব্দে মুখর হয়ে উঠলো বনভূমি, ঝরণার পানিতেও ছড়িয়ে পড়লো সে হাসির উচ্ছলতা।

একসময় বনহুর আর নূরী অশ্বপৃষ্ঠে চেপে ফিরে এলো আস্তানায়।

নূরী ওর বিশ্রামকক্ষে চলে গেলো ভিজে কাপড় পাল্টাবার জন্য।

বনহুর নিজ দেহের বসন পাল্টে নিয়ে আয়নার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। চুলগুলো আঁচড়ে নিলো চিরুণী দিয়ে, তারপর সোজা গিয়ে হাজির হলো নূরীর কক্ষে।

নূরীর তখনও কাপড় পাল্টানো হয়নি, বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই নূরী নিজের ওড়নাখানা সম্মুখে পর্দার মতো মেলে ধরলো, বললো— কার আদেশে তুমি এ কক্ষে প্রবেশ করলে?

বনহুর মৃদু হেসে বললো— আমার ইচ্ছার আদেশে।

বেরিয়ে যাও বলছি।

যদি না যাই?

শাস্তি পেতে হবে।

বেশ; তাই গ্রহণ করবো। কথাটা বলে এগিয়ে যায় বনহুর নূরীর দিকে।

নূরী লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেলো।

বনহুর একেবারে ওর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো, দক্ষিণ হস্তে চিবুকটা উঁচু করে ধরে বললো—দাও, শাস্তি দাও— কি শাস্তি দেবে?

নূরী পালাবার চেষ্টা করলো।

বনহুর ধরে ফেললো ওকে, বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো।

❑

নূরী বনহুরকে সাজিয়ে দিলো আপন হাতে, জামার বোতাম লাগিয়ে দিয়ে বললো— যাও হুর, মনিরা আপার সঙ্গে দেখা করে এসো।

বনহুর পাগড়ীটা মাথায় পরে ঠিক করতে করতে বললো—তুমি যাবে না নূরী?

না, আজ নয়।

মনিকে দেখতে যাবে না?

যাবো কিন্তু আজ নয়......একটু থেমে বললো নূরী, একদিন রাতের অন্ধকারে আমাকে তুমি নিয়ে যেও, গোপনে আড়াল থেকে ওকে আমি দেখে আসবো। আজ তুমি যাও হুর.......

বনহুর আর নূরী আস্তানার গুহামুখে এসে দাঁড়ালো।

তাজসহ দু'জন অনুচর অপেক্ষা করছিলো, রহমানও ছিলো সেখানে।

বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসলো।

রহমান ও অনুচরদ্বয় কুর্ণিশ জানিয়ে সরে দাঁড়ালো।

নূরী অস্ফুট কণ্ঠে বললো— খোদা হাফেজ!

অল্পক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো বনহুর।

নূরীর বুক চিরে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। ফিরে এলো নূরী নিজের ঘরে।

এতোক্ষণ নাসরিন আড়ালে থেকে সব লক্ষ্য করছিলো, নূরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই নাসরিন তার পাশে এসে দাঁড়ালো, শান্ত কণ্ঠে ডাকলো—নূরী!

নূরী ছোট্ট একটু জবাব দিলো—কি?

বসে পড়লো নূরী শয্যার পাশে।

নাসরিনও বসলো, বললো— নূরী, একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করবো, সঠিক জাবাব দিবি তো?

বলবার মত হলে নিশ্চয়ই বলবো।

নাসরিন নূরীর পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো, তীক্ষ্ণ নজরে দেখে নিলো সে নূরীর মুখমন্ডল, তারপর বললো— সত্যি বল্‌ছি, সর্দারকে পাঠাতে তোর মনে এতোটুকু বাধলো না?

অবাক হয়ে বললো নূরী— তার মানে? আমি তোর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না নাসরিন?

তা পারবি কেন! বলছি সর্দারকে ওখানে পাঠাতে তোর মনে একটুও কি বাধে না নূরী?

নূরী এবার স্পষ্ট বুঝে নিলো নাসরিনের কথার মানেটা। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে নিয়ে মুখে হাসি টেনে বলে নূরী— ওখানে মানে চৌধুরীবাড়িতে?

হাঁ, তোর মনিরা আপার ওখানে।

নাসরিন, তুই কি জানিস না কেন তাকে ওখানে পাঠিয়ে দেই?

জানি, আর জানি বলেই আমি তোকে জিজ্ঞাসা করছি।

সব জেনেও তুই না বুঝার ভান করিস কেন বল্‌তো? একটু থেমে উদাস কণ্ঠে বলে নূরী, ওকে আটকে রাখার মত ক্ষমতা আমার নেই নাসরিন তাই....বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে নূরীর কণ্ঠ।

রাগতঃকণ্ঠে বলে উঠলো নাসরিন— কোনো নারীই এমন নেই, যে তার স্বামীকে বিনা দ্বিধায় দ্বিতীয় কোনো নারীর হাতে তুলে দিতে পারে। যেমন করে সর্দারকে তুই....

নূরী নাসরিনের মুখে হাতচাপা দেয়— চুপ কর নাসরিন, চুপ কর তুই। বুঝবি না তুই আমার মনের কথা।

বুঝতে আমি চাই না। শুধু আশ্চর্য হয়ে যাই আমি তোর আচরণ দেখে। স্বামীকে আর একজনের হাতে তুলে দিয়ে হাসিমুখে কেউ ফিরে আসতে পারে না।

আমি পারি নাসরিন, আমি পারি। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে কি যেন ভাবে নূরী, তারপর আবার বলে— মেয়েদের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ হলো তার স্বামী। বনহুর আমার অমূল্য সম্পদ....আমি আমার সেই সম্পদ কেন তুলে দেই অপর আর একজনের হাতে জানিস? কত ব্যথা আমি বুকে চেপে হাসিমুখে ওকে বিদায় দেই তোকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না নাসরিন। ওখানে যাবার জন্য যখন আমি নিজের হাতে ওকে সাজিয়ে দেই তখন আমার বুকের ভিতরে ঝড় বইতে থাকে কিন্তু আমি মুখে হাসি টেনে সব ব্যথা চেপে রাখি অতি সাবধানে। যেন আমার হুর বুঝতে না পারে আমার মনের ব্যথা....

আশ্চর্য মেয়ে তুই! তোকে দেখে একটুও বুঝবার জো নেই তোর ভিতরে কি হচ্ছে। কিন্তু ওভাবে সর্দারকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয় নূরী।

ওর উপর আমার যেমন দাবী রয়েছে তেমনি রয়েছে মনিরা আপার। হুর আমার একার নয়....গলা ধরে আসে নূরীর। গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

নাসরিন বলে— যা ভেবেছিলাম তা নয়। নূরী, তোর হাসি ভরা মুখ দেখে তোর ভিতরটা বুঝবার জো নেই।

হাঁ, নাসরিন,. আমার মত সুখীও যেমন নেই, তেমনি আমার মত দুঃখীনিও নেই এ পৃথিবীতে। আমার বনহুরের মত সম্পদ পেয়েও আমি তাকে.....না না, চলে যা, নাসরিন আমার কাছ থেকে চলে যা। আমাকে একা থাকতে দে এখন।

নাসরিনকে কথাটা বলেই নূরী দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠলো। আংগুলের ফাঁকে ঝরে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। দারুণ উষ্ণতায় বরফ গলে যেমন পানি হয়ে গড়িয়ে পড়ে, তেমনি নাসরিনের কথায় নূরীর বুকের ভিতরে জমাট ব্যথা গড়িয়ে পড়ে তার দু'চোখে।

এই মুহূর্তে নূরীকে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না, একটু পূর্বে এই নূরীই বনহুরের পাশে উচ্ছল তরঙ্গের মতই চঞ্চলভাবে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিলো, হাসি-গানে ভরিয়ে তুলেছিলো বনহুরকে।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে নাসরিন নূরীর অশ্রুসিক্ত মুখখানার দিকে।

বনহুর তখন তাজের পিঠে ছুটে চলেছে কান্দাই নগরী অভিমুখে।

শহরের অনতিদূরে অশ্ব রেখে বনহুর নেমে পড়লো।

পথের উপর গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো কায়েস।

বনহুর অশ্ব ত্যাগ করে গাড়িতে চেপে বসলো।

কায়েস তাজ নিয়ে ফিরে চললো আস্তানা অভিমুখে।

বনহুর প্রথমে তার শহরের আস্তানায় গেলো, সেখানে সে ড্রেস পাল্টে স্বাভাবিক স্যুট পরে নিলো। ছদ্মবেশের প্রয়োজন এখন তার নেই কারণ নূর তাকে চেনে, পিতা বলে জেনেছে তাকে। নূর জানে, তার আব্বু দূর দেশে কোথাও চাকরি করে, সময় পেলেই আসে সে তাদের দেখতে।

বনহুর যখন চৌধুরীবাড়ি এসে পৌঁছলো তখন সবার আগে ফুলমিয়া তাকে দেখতে পেলো, আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে এলো সে তার পাশে— সর্দার!

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায়, বলে সে— চুপ্, সর্দার বলে ডাকবে না, বুঝলে?

তবে কি বলে ডাকবো?

ছোট সাহেব বলে ডাকবে।

বেশ, তাই ডাকবো ছোট সাহেব।

নূর কোথায়?

উপরে দাদী আম্মার ঘরে বসে পড়া মুখস্থ করছে।

তুমি কেমন আছো ফুলমিয়া?

খুব ভাল আছি। এ বাড়ির সবাই আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে।

এমন সময় সরকার সাহেব দেখে ফেলেন, আনন্দভরা কণ্ঠে বলে উঠেন— ছোট সাহেব এসেছেন! ছোট সাহেব এসেছেন, নূর, নূর। তোমার আব্বু এসেছেন......

বনহুর এগিয়ে এসে সরকার সাহেবের হাতে হাত রেখে করমর্দন করে বললো— সরকার সাহেব, ভাল আছেন তো?

হাঁ আছি। আপনি কেমন আছেন ছোট সাহেব?

ভালো।

ততক্ষণে অন্দরবাড়ির মধ্যে বনহুরের আগমনবার্তা পৌঁছে গেছে, নূর আর মরিয়ম বেগম নেমে আসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে।

নূর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বনহুরকে— আব্বু, তুমি এসেছো আব্বু.....

বনহুর পুত্রের চিবুক ধরে নাড়া দেয়, তারপর ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে বলে—হাঁ আব্বু, এসেছি।

অদূরে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছেন মরিয়ম বেগম বনহুর আর নূরের উচ্ছল আনন্দভরা মুহূর্ত তাঁর হৃদয়ে অনাবিল একটা আনন্দ দান করে। নির্বাক নয়নে তিনি এ দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।

বনহুর নূরকে হাতের উপর তুলে নিয়ে আদর করে, তারপর এগিয়ে এসে মায়ের কদমবুসি করে।

বনহুর মায়ের কদমবুসি করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সিঁড়ির উপর ধাপে নজর চলে যায়, মনিরার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় তার। আজ মনিরা অভিমানে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না, একটি মিষ্টি হাসি দিয়ে স্বামীকে অভিনন্দন জানায়।

বনহুর নূর আর মা সহ উপরে উঠে আসে।

আজ বনহুরের আগমনে চৌধুরীবাড়িতে আনন্দ-হিল্লোল বয়ে যায়। সরকার সাহেব থেকে বাড়ির মালী পর্যন্ত খুশিতে ডগমগ। মরিয়ম বেগম খোদার কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া করলেন। তিনি রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, পুত্রের জন্য নানারকম খাবার নিজ হাতে তৈরি করতে বসে গেছেন।

নূর তো আব্বুকে পেয়ে বসেছে; আর নড়বার লক্ষণ নেই তার মধ্যে। সরকার সাহেব, ফুলমিয়া কত করে ওকে ডেকেছে তবু নূর অচলঅটল। সে ভাবছে, সরে গেলেই তার আব্বু যদি পালিয়ে যায়। এখন নূর পূর্বের মত ছোট্টটি নেই— সে এখন বেশ বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে।

বনহুর কিন্তু মনিরাকে নিবিড় করে পাবার জন্য ভিতরে ভিতরে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, একসময় সুযোগ পেয়ে মনিরাকে ধরে ফেললো সে।

মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে জোরপূর্বক নিজকে মুক্ত করে নিয়ে বললো— আমাকে যে কথা দিয়েছিলে স্মরণ আছে তো?

বনহুর মৃদু হেসে বললো— আছে।

বলো তো কি কথা দিয়েছিলে তুমি আমাকে? মনিরা জানে, তার স্বামী সব ভুলে গেছে, এবং সেই কারণেই এই মুহূর্তে বললো সে কথাটা।

বনহুর কিন্তু সব ভুলে বসে আছে তবু মিছেমিছি বললো সে সব তার মনে আছে।

মনিরা ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো— বলো কি কথা দিয়েছিলে? কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তুমি, বলো?

বনহুর মাথা চুলকায়, ছাত্র যেমন মাষ্টার সাহেবের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে মুখ কাঁচুমাঁচু করে তেমনি বনহুর মনিরার প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ে।

মনিরা বুঝতে পারে, সব বিস্মৃত হয়ে গেছে বনহুর, তাই সে গম্ভীর হবার ভান করে বলে— সব ভুলে গেছো, না?

মোটেই না।

তবে মাথা চুলকাচ্ছো কেন?

লক্ষ্মীটি, স্মরণ করতে দাও।

কি বললে, সব তুমি ভুলে গেছো?

এবার বনহুর মনিরার হাত দু'খানা চেপে ধরে মিনতিভরা স্বরে বললো— আমাকে ক্ষমা করো মনিরা, আমি স্মরণ করতে পারছি না তোমাকে কি কথা দিয়েছিলাম?

এই মন নিয়ে তুমি বিশ্বখ্যাত দস্যুসম্রাট হয়ে.....

বনহুর মনিরার মুখে হাতচাপা দেয়— চুপ্ করো, নূর শুনে ফেলবে....এবার বলো কি কথা?

আবার তুমি শপথ করো, আমার কথা রাখবে?

আমতা আমতা করে বলে বনহুর— কি কথা না শুনে কি করে শপথ করবো, বলো?

তুমি একদিন শপথ করেছিলে......

আজ বলো, ভেবে দেখি যদি......

না, যদি নয়, রাখতে হবে; নাহলে আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না আর কোনোদিন। যেতে দেবো না তোমাকে আস্তানায়।

মনিরা!

হাঁ, আমি তোমাকে বন্দী করে রাখবো।

সর্বনাশ, বন্দী! হাত জোড় করে বনহুর মনিরার সম্মুখে— ক্ষমা করো মনিরা!

না, ক্ষমা আমি করবো না। তুমি কথা দিয়েছিলে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারী হবে।

ওঃ এই কথা! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—হাঁ, সংসারী হবো এবার।

হবো নয়, হতে হবে।

হাঁ, আমি সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিলাম মনিরা।

তা ভুলবে না? তোমার মত একজন গুণবান মানুষের মনে থাকা কিছুই সম্ভব নয়। যাক্, বলো এতোদিন কেন আসোনি?

আমি বলেছি, ঐ প্রশ্ন তুমি আমাকে করো না মনিরা। কারণ আমি তোমাকে সঠিক কোনো জবাব দিতে পারবো না। তা'ছাড়া তুমি তো জানোই কেন আমি আসতে পারি না। যাক্ ও সব কথা, বলো কিভাবে আমি সংসারী হতে পারি?

বনহুর মনিরার কোলে মাথা রেখে শুয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো তার মুখে।

মনিরা স্বামীর চুলে ধীরে ধীরে আংগুল চালাতে লাগলো, আজকের এ পরিবেশে কতদিন স্বামীকে পায়নি সে। অতৃপ্ত নয়নে মনিরা স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

মনিরা বললো একসময়— সত্যিই তুমি সংসারী হবে তো?

বিশ্বাস করো, এবার সংসারী হবো।

মনিরা আনন্দে দু'চোখ বন্ধ করে বললো— আমার সাধনা তাহলে স্বার্থক হবে।

বনহুর মনিরার দীপ্ত উজ্জ্বল সুন্দর মুখে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, সত্যিই কি সে মনিরাকে সুখী করতে সক্ষম হবে? সত্যি কি সে

পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের মত সংসারী হতে পারবে? যেমন করে হোক, তার শপথ রক্ষা করতেই হবে, দস্যুতা ছেড়ে দেবে সে এবার......

বনহুর ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে যায়।

মনিরা বলে উঠে— কি ভাবছো শুনি?

উঁ, কি ভাবছি.....

হাঁ, বলো তুমি কি ভাবছিলে?

ভাবছিলাম, এবার সংসারী হবো, দস্যুতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করবো। উঠে বসলো বনহুর সোজা হয়ে, বললো আবার— সরকার সাহেবকে ডাকো দেখি, কথা আছে তার সঙ্গে।

মনিরা বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো সরকার সাহেবসহ।

সরকার সাহেব কক্ষে প্রবেশ করে বললেন— ছোট সাহেব, আমাকে ডেকেছেন?

হাঁ বসুন। মনিরা, তুমি আম্মাকে ডেকে আনো একবার।

সরকার সাহেব একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

মনিরা মামীমা সহকারে এলো।

মরিয়ম বেগম নিজ হাতে রান্নাবান্না করছিলেন— তিনি আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালেন পুত্রের সম্মুখে।

বনহুর মাকে লক্ষ্য করে বললো— বসো মা। আমার পাশে এখানে বসো।

মরিয়ম বেগম পুত্রের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন।

মনিরাও বসলো। সে ভাবছে, না জানি তার স্বামী কি বলবে, কেনই বা ডেকেছে সে ওদের।

বনহুর বললো— মা, আমি তোমার কথা রাখবো। তুমি একদিন বলেছিলে— মনির, তুই সংসারী হ'। আমি এতোদিন তোমার কথা রাখতে পারিনি, এবার সংসারী হবো।

বনহুরের কথায় খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মরিয়ম বেগমের মুখমন্ডল।

সরকার সাহেবের চোখেমুখে ফুটে উঠলো একটা আনন্দ উচ্ছ্বাস।

মনিরার অন্তরে খুশির উৎস বয়ে চলেছে— তার স্বামীকে এখন থেকে নিবিড় করে পাবে সে সর্বক্ষণের জন্য। নারীর স্বামীই যে সব কিছু, মনিরা অনাবিল আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো।

বনহুর বললো—সরকার সাহেব, আপনি শহরের মধ্যে আমার জন্য একটি বাড়ি খোঁজ করুন।

মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে বললেন—বাড়ি! বাড়ি কি হবে মনির? এ বাড়ি কি হলো?

তা হয় না মা। তুমি তো জানো, এ বাড়ি আমার জন্য নিরাপদ স্থান নয়। সর্বক্ষণ এ বাড়ির আনাচে-কানাচে পুলিশ শ্যেনপাখীর মতই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কাজেই আমাকে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে শহরে বাস করতে হবে।

সরকার সাহেব বললেন—হাঁ বেগম সাহেবা, মনিরের জন্য ভিন্ন বাড়ির একান্ত প্রয়োজন। এ বাড়ি তার জন্য কোনো সময়ই সমীচীন নয়। তাছাড়া আশেপাশে নিকটেও তার থাকা চলবে না।

ঠিক বলেছেন সরকার সাহেব, আপনি শহরের এমন স্থানে আমার জন্য বাড়ি সংগ্রহ করুন যেখানে আমি নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করতে পারবো। টাকার জন্য ভাববেন না, যত টাকা লাগে দেবো।

❑

বনহুরের কথামত সরকার সাহেব একটি সুন্দর বাড়ির সন্ধানে রইলেন। চললো তাঁর বাড়ি খোঁজা।

পেয়েও গেলেন তিনি একটা মনের মত বাড়ি।

শহরের সেরা জায়গা গুলবাগ, সেখানে একটি অতি সুন্দর বাড়ি ভাড়া পেলেন সরকার সাহেব। মস্তবড় বাড়ি। প্রায় দু'বিঘা নিয়ে বাড়িখানা। বাড়ির চারপাশে খোলা জায়গা। সম্মুখে ফুলের বাগান। পাশেই একটি সুন্দর পুকুর। পুকুরে পদ্মফুলের থোকা নীল সচ্ছ জলে দোল খাচ্ছে।

সরকার সাহেবের মনের মত হয়েছে বাড়িটা, যদিও দাম অত্যন্ত বেশি।

বাড়িখানা সরকার সাহেব মনিরের জন্য সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে একেবারে তৈরি করে রাখলেন।

মনিরা প্রতীক্ষা করতে লাগলো, আবার কবে আসবে মনির কে জানে। নতুন বাড়িতে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো সে। নূরের আনন্দ আর ধরছে না, এখন থেকে সে আব্বুকে পাবে সর্বক্ষণ পাশে।

যেদিন থেকে নূর তার আব্বুকে খুঁজে পেয়েছে সেদিন থেকে তার কচি মনে অনাবিল একটা আনন্দ ফুলঝুরির মত ঝরে পড়ছে। সব সময় নূর আব্বুর জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে—কখনও আম্মাকে কখনও দাদীআম্মাকে কখনও বা সরকার সাহেব আর ফুলমিয়াকে ব্যস্তসমস্ত করে তোলে—বলো আমার আব্বু কখন আসবে? বলো আমার আব্বু কখন আসবে?

কেউ বলে, কাল আসবে। কেউ বা বলে, আজ। নূরের এসব কথায় প্রাণ ভরে না। দাদীআম্মার কথা বিশ্বাস হয়, দাদী আম্মা বলেছেন—নূর, তোর আব্বু আমার ছেলে, আজ না এলে কাল আসবে, কাল না এলে পরশু আসবে, আসবেই একদিন। দাদু, তুমি আব্বুকে এবার কিছুতেই ছেড়ে দেবে না, কেমন?

নূর ভাবে, সত্যিই সে এবার আব্বুকে ধরে রাখবে, যেতে দেবে না সে কিছুতেই। তাই মাথা নেড়ে দাদীআম্মার কথায় সায় দেয়।

নূরের বাসনা পূর্ণ হলো। পিতাকে সে পেলো এবার একান্ত পাশে। আনন্দ উচ্ছ্বাস ভরপুর ওর কচি মন, সর্বক্ষণ আব্বুর কাছে থাকে সে। একদন্ড খেলা করতেও যায় না নূর, হঠাৎ যদি আবার পালিয়ে যায় তার আব্বু।

ছেলের ব্যাপার দেখে হাসে বনহুর।

মনিরা বলে—কি, হাসছো যে বড়?

হাসবো না? তোমার ছেলের কান্ড দেখে না হেসে পারছি না মনিরা, সব সময় আমাকে কাছে কাছে ধরে রাখতে চায়---

ও বুদ্ধিমান, জানে যদি পালিয়ে যাও।

মা আর ছেলের একরকম বুদ্ধি দেখছি।

মনিরা স্বামীর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলে—দেখো অবুঝ ছেলে তবু তার আব্বুকে পেয়ে কত খুশি! আর তুমিই পারলে না আজও স্ত্রী-

পুত্রকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে। কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মনিরা।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলে—মনিরা এ তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কে বলে আমি তোমাদের সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিনি?

আমার মন বলে। গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বলে মনিরা।

তোমার মন নিশ্চয়ই তোমাকে ধোকার মধ্যে ফেলেছে। মনিরা, তুমি জানো না, আমার জীবনে তোমরা প্রেরণার উৎস। সত্যি, মাঝে মাঝে আমি একেবার হতাশায় ভেংগে পড়ি, তখন তোমাদের পাশে এসে দাঁড়ালে অনাবিল একটা আনন্দে ভরে উঠে আমার প্রাণ। মনিরা, আমি চাই তুমি কোনোদিন আমার উপর বিশ্বাস হারাবে না।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রাখলো। কোনো কথা সে মুখে না বললেও তার মন বললো, না গো না, তোমাকে কোনোদিন আমি অবিশ্বাস করবো না।

বনহুর স্ত্রীর মুখখানা তুলে ধরলো নিজের মুখের কাছে।

মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করে বললো —ছিঃ নূর কাছেই আছে, দেখে ফেলবে যে!

বনহুর স্ত্রীকে মুক্ত করে দেয়।

❑

কয়েক দিন বেশ ভালই কাটলো, দস্যু বনহুর বনে গেছে নাগরিক মনির চৌধুরী। স্ত্রী-পুত্র, চাকর-বাকর নিয়ে সুন্দর সংসার কিন্তু এতো সুখ কি আর বনহুরের সইবে!

হঠাৎ একদিন ছদ্মবেশে রহমান এসে পড়ে সেখানে। দাঁড়ি গোফ সাদা, মাথায় একরাশ পাকা চুল, গলায় পাথরের মালা। বৃদ্ধ দরবেশের সাজে সজ্জিত হয়ে এসেছে আজ সে সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে।

মনিরার কড়া নিষেধ, বাইরের কোনো লোক যেন গেটের এ পাশে না আসতে পারে, যতক্ষণ না তারা ভিতরে প্রবেশের সম্মতি দান করে। মনিরার

ভয় দস্যু স্বামী নিয়ে, কখন কে কোন্‌ভাবে আসবে, কোন্ অভিসন্ধি নিয়ে তাই বা কে জানে! এমন কি পুলিশের লোকও তো আসতে পারে।

রহমান যখন বৃদ্ধ দরবেশের সাজে সজ্জিত হয়ে গেটের পাশে এসে দাঁড়ালো তখন দারওয়ান লাঠি উঁচিয়ে বললো—খবরদার, এক পাও মত আনা। এহি লাঠিমে মাথা তোমহারা ঠান্ডা করদেঙ্গে---

রহমান ক্ষণিকের জন্য ভড়কে যায়, সে স্বাভাবিক ড্রেসে আসতে পারতো কিন্তু যে নতুন দারওয়ান এবং চাকর-বাকর আছে তারা কেউ তাকে চেনে না। তাছাড়া রহমানকে মনিরা নিজেও মানা করে দিয়েছে, এ বাড়িতে তারা যেন না আসে এবং সর্দারকে দস্যুতায় উৎসাহ না দেয়।

মনিরা রহমান এবং কায়েস্বকে চিনতো, ভালোও বাসতো স্বামীর অনুচর বলে। কিন্তু এখন সে চায় না, তারা আসে বা তার স্বামীকে আস্তানায় নিয়ে যায়। এসব নানা কারণে রহমান আজ ছদ্মবেশে এসেছে সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা না করলেই নয়। কান্দাই-এর অদূরে মরিলা দ্বীপে এক ভয়ঙ্কর কাপালিকের আবির্ভাব ঘটেছে। অতি ভয়ঙ্কর সে সন্ন্যাসী কাপালিক, যে প্রতিদিন সাতটি করে নরহত্যা করে এবং সেই নরমুন্ডগুলোর রক্ত পান করে। প্রতিদিন বহু লোক এই কাপালিকের হাতে জীবন বিনাশ করে চলেছে। শুধু মরিলা দ্বীপই নয়, দ্বীপের আশে পাশে যেসব শহর-বন্দর-নগর রয়েছে, প্রতিদিন এই সব জায়গা থেকে লোক চুরি হয়ে যাচ্ছে। একটি দুটি নয়, শত শত লোক হারিয়ে যাচ্ছে এসব জায়গায় থেকে।

ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন থেকেই চলেছিলো। কিন্তু তেমন করে কারো কানে পৌঁছায়নি। বিশেষ করে বনহুরের আস্তানায় পৌঁছতে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে।

ঘটনাটা যখন শহরে-বন্দরে এখানে-সেখানে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে তখন রহমান আর চুপ থাকতে পারেনি, সে নিজে গিয়েছিলো মরিলা দ্বীপে, যদি সর্দারকে না জানিয়ে এর কোনো প্রতিকার করতে পারে, এই আশায়।

কিন্তু রহমান বিফল হয়েছে। মরিলা দ্বীপই শুধু নয়, মরিলা দ্বীপের আশেপাশে যেসব শহর-বন্দর আছে সেগুলোতে খোঁজ নিয়ে হতভম্ব

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। সে নিজের চোখে দেখেছে রাজপথের বুকে পড়ে আছে রক্তমাখা মুন্ডহীন দেহ।

অনেক সন্ধান করেও কেউ জানতে পারেনি বা দেখেনি, কে কখন এইসব অসহায় লোকগুলোর এমন অবস্থা করেছে।

তবে লোকমুখে প্রচার শুনেছে, এক ভয়ঙ্কর কাপালিকের আবির্ভাব ঘটেছে যে সকলের অলক্ষ্যে নরহত্যা করে যাচ্ছে, অথচ কেউ তাকে ধরতে পারছে না বা দেখতে পাচ্ছে না।

একদিন নয়, কয়েক সপ্তাহ ধরে রহমান, কায়েস ও আরও কয়েক জন মিলে এই নরহত্যাকারী কাপালিকের অনুসন্ধান চালিয়েছে কিন্তু তাকে খুঁজে বের করা দূরের কথা—কোথায় থাকে, কিভাবে সে এতোগুলো পথচারীর মধ্য একজনকে হত্যা করে মস্তক নিয়ে যায়, এই রহস্য তারা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি।

বরং তাদের দলের একজনকে হারিয়েছে রহমান। তার মস্তক বিহীন দেহটা যেদিন পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলো সেইদিন রহমান মরিলা দ্বীপ ত্যাগ করে চলে এসেছে। দুঃখ-ব্যথায় মন তার ভরে গিয়েছিলো, আহা, বেচারী শহীদ কেমন করে প্রাণ হারালো। তখন রহমান ফিরে এসেছিলো আস্তানায়।

ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা করেছিলো সেদিন রহমানের, কারণ শহীদের মৃত্যুর জন্য দায়ী সে। মরিলা দ্বীপে একটা হোটেলে উঠেছিলো রহমান তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। ভেবেছিলো, সর্দারকে না জানিয়েই যদি এই ভয়ঙ্কর কাপালিক যমদূতটাকে নিঃশেষ করে দ্বীপবাসী এবং অন্যান্য নগরবাসীর জীবন রক্ষা করতে পারে তাহলে ভালোই হয়। এই সামান্য ব্যাপারে সর্দারকে খাটাতে চায় না সে। তাছাড়া সর্দারকে নাগরিক হিসাবে দেখলে মন তার উৎফুল্ল হয়ে উঠে, আনন্দে ভরে উঠে তার হৃদয়। সর্দারের জন্য রহমান এতো প্রফুল্ল নয়, মনিরার খুশিতে তার এতো আনন্দ।

রহমান আজ বাধ্য হয়েই এসেছে, যতক্ষণ সে নিজে পেরেছিলো ততক্ষণ সর্দারকে সে একথা জানাতে চায়নি, শেষ অবধি পারলো না আর চুপ থাকতে। এই কয়েক সপ্তাহে বহুলোক প্রাণ হারিয়েছে সেই জঘন্য কাপালিকের হাতে।

রহমান যখন দরবেশ বাবাজীর বেশে ফটকের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো তখন দারওয়ান তেড়ে এলো মারতে।

রহমান প্রথমে ভড়কে গেলো কিন্তু পরক্ষণে সামলে নিয়ে বললো—বাবা, একটু পানি খাওয়াবে? একটু পানি----

দারওয়ান আরও জোরে খেঁকিয়ে উঠলো—আরে ভাগ্ ভাগ্। পানি পিউগি তব বাহারমে বহুৎ পানিকে কল হ্যায় পি লেও।

রহমান হতাশ হলো এবার কিন্তু ফিরে গেলে তার চলবে না, যেমন করে হোক সর্দারের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

দরবেশ বাবাজী তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে দারওয়ান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো, লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে এলো—আরে যাও না বাবা, হিয়া কাহেকো খাঁড়া?

রহমান নিরাশ দৃষ্টি মেলে তাকায় ফটকের ভিতর দিয়ে বাগান বাড়ির দিকে। এই মুহূর্তে সর্দার যদি একবার বাইরে এসে পড়তো তবু হতো, যা হোক করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতো তার। হায় হায়, বৌরাণী এবার কি কড়া শাসনের ব্যবস্থা করেছে। রহমানের হাসিও পায়, দুঃখও হয়। দস্যুসর্দার এবার আসল বন্দী হয়েছে।

রহমানের মনের কথা মিথ্যা নয়, মনিরা এবার খুব করে বুদ্ধি-কৌশল এঁটেছে। দস্যুস্বামীকে সে নাগরিক বানাতে চায়। বনের সিংহকে যেমন খাঁচায় আবদ্ধ করে তেমনি পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা অন্তপুরে আবদ্ধ করেছে মনিরা স্বামীকে। যেন সে কোনোক্রমে পালাতে না পারে। এ জন্য সদাসর্বদা কড়া নজর রেখেছে সে। বাইরের কারো প্রবেশ নিষেধ এ বাড়িতে।

খাঁচায় বন্দী হয়ে বনের সিংহ যেমন ছটফট করতে থাকে কিন্তু কিছু বলতে পারে না, তেমনি অবস্থা হয়েছে বনহুরের। তার আস্তানা, সঙ্গী-সাথী আর নূরীকে ছেড়ে যদিও খুব খারাপ লাগছিলো তবু সে নীরব ছিলো মনিরার ভয়ে।

মনিরা স্বামীকে সর্বক্ষণ তার চিন্তা থেকে বিরত রাখার জন্য নানাভাবে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। সব সময় পাশে পাশে থাকে সে, যদিও কোনো

সময়ের জন্য সরে যায় তখন মনিরা নূরকে ভালোভাবে সতর্ক করে দেয়, যেন তার আব্বা সরে যেতে না পারে।

মনিরার কান্ড দেখে হাসে বনহুর। পুলিশ যাকে হাঙ্গেরী কারাগারে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি, লৌহশিকলে যাকে বেঁধে রাখতে পারেনি পুলিশ সুপার জার্ফরী, আর তাকেই কিনা নজর বন্দী করে রেখেছে মনিরা।

আজ ক'দিন থেকে বনহুরের মনটা ছটফট করছিলো, সেকি আর নিরিবিলি চুপচাপ বসে থাকার মানুষ!

বনহুর দোতলার ছাদে পায়চারী করছিলো আর ভাবছিলো তার আস্তানার কথা। মনিরা অদূরে একটা সোফায় বসে সোয়েটার বুনছিলো তার মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলো—লক্ষ করছিলো সে স্বামীকে। স্বামীর মনে যে কোনো একটা গভীর চিন্তা জট পাকাচ্ছিলো তা বেশ বুঝতে পারছিলো সে।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় ফটকের দিকে।

দারওয়ান আর দরবেশ বাবাজীর মধ্যে তখন কথা কাটাকাটি চলছে।

বনহুর আচমকা পায়চারী বন্ধ করে থেমে পড়লো, তাকালো সে দরবেশ বাবাজী আর দারওয়ানের দিকে।

অকস্মাৎ স্বামীকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেখে মনিরা সোয়েটারের কাঁটা হাতে উঠে আসে, স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাকায় মনিরা সম্মুখে, যেদিকে বনহুর তাকিয়েছিলো।

দরবেশ বাবাজীর দিকে তাকিয়ে বলে বনহুর, মনিরা, দেখো দেখো, একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ দরবেশ বাবা এসেছেন।

মনিরার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠে, বলে মনিরা—দেখেছি।

বনহুর বলে উঠে—চলো দেখি কি চায় বেচারী!

শুষ্ককণ্ঠে বলে মনিরা—তোমাকে আর দেখতে হবে না।

বনহুর আমতা আমতা করে বলে—হয়তো কিছু চায় সে। দেখছো না আমাদের দিকে কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

দেখেছি। যা দিতে হয় আমি নিজে গিয়ে শুনে দিয়ে আসছি। তোমাকে সেজন্য মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি বসো ঐ সোফায় গিয়ে।

বনহুর অগত্যা বাধ্য ছাত্রের মত স্ত্রীর আদেশ পালন করলো।

মনিরা নেমে গেলো নিচে।

এগিয়ে আসতেই রহমান হকচকিয়ে গেলো, এবার বুঝি তার সব কারসাজি ফাঁস হয়ে যাবে বৌরাণীর কাছে। ভয়ঙ্করভাবে জব্দ হবে সে। কারণ বৌরাণী তাকে মানা করে দিয়েছে, আস্তানার কোনো খবর নিয়ে যেন সে না আসে। এলে কিন্তু ক্ষমা করবে না সে কিছুতেই। নিজে সে পুলিশ ডাকিয়ে ধরিয়ে দেবে। এমন কি ওয়্যারলেসটাও সরিয়ে ফেলেছে মনিরা আস্তানায় যোগাযোগের ভয়ে।

রহমান মনিরাকে আসতে দেখে পালাবে না থাকবে ভাবছে, তখন দারওয়ান রহমানের জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে—মেম সাহেব আতা, তুম ভাগনে মাঙ্গতো না, নেহি ছোড়েঙ্গা তুমকো--

রহমান ঢোক গিলে বলে—মেম সাহেবকে দেখে পালাবো কেন বাবা, বরং তাকে দোয়া করে যাবো। দোয়া করে যাবো।

ততক্ষণে মনিরা এসে দাঁড়িয়েছে ফটকের পাশে, তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে দেখে নিলো দরবেশ বাবাজীর আপাদমস্তক।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে তখন রহমান—সর্বনাশ, এই বুঝি তাকে চিনে ফেলে, তাহলেই হয়েছে—বৌরাণীর কাছে বিশ্বাস হারাবে সে চিরদিনের জন্য। কারণ রহমান মনিরার কাছে শপথ করেছিলো—অবশ্য বাধ্য হয়েই বলেছিলো রহমান—আমি শপথ করছি বৌরাণী, সর্দারের কাছে আর আসবো না। আজ এসেছে রহমান শপথ ভঙ্গ করে, শত শত জনগণের জীবন রক্ষার্থে সর্দারের সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় সে খুঁজে পায়নি।

মনিরা বেশ কিছুক্ষণ গভীরভাবে দরবেশ বাবাজীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—কি চাও দরবেশ বাবা?

এতোক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো রহমান, বুকের মধ্যে যেন ওর হাতুড়ির ঘা পড়ছিলো। দস্যু বনহুরের পার্শ্ব অনুচর হয়ে একটা নারীর কাছে দুর্বল নাচারের মত, অপরাধীর মত কাবু হয়ে পড়েছিলো সে। মনিরা যখন বললো—কি চাও দরবেশ বাবা? রহমানের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া যেন আবার তখন চলতে শুরু করলো। গলার স্বর যতদূর সম্ভব পাল্টে নিয়ে বললো—মা, আপনার অসীম দয়া—আমি বৃদ্ধা দরবেশ, একটু ঠান্ডা পানি পান করতে চাই।

মনিরা কোমল স্বরে বললো—কতদূর থেকে তুমি ঠান্ডা পানি পান করতে এসেছো বাবাজী?

হঠাৎ মনিরার এ প্রশ্নে ভড়কে গেলো রহমান মুহূর্তের জন্য। কারণ মনিরার প্রশ্নটা স্বাভাবিক হলেও সচ্ছ ছিলো না। কেমন যেন একটু সন্দেহের ছোঁয়াচ ছিলো মনিরার গলার স্বরে। রহমান নিজের দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—বহু দূর থেকেই আমি এসেছি মা। তবে ঠান্ডা পানি খাবার জন্যই আসিনি--

আমি জানি, তুমি কেন এসেছো দরবেশ বাবাজী।

সঙ্গে সঙ্গে রহমানের মুখমন্ডল বিবর্ণ হলো। পালাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো সে এবার।

মনিরা হেসে বলে উঠলো—ঠান্ডা পানি পানের আশায় আসেননি, এসেছেন মনের আকর্ষণে, তাই না দরবেশ বাবাজী?

রহমান মাথা নিচু করে রইলো, কোনো জবাব সে দিলো না বা দেবার সাহস পেলো না। রহমান স্পষ্ট বুঝতে পারলো, বৌরাণী তাকে চিনতে পেরেছে এবং সেইজন্য জব্দ করছে সে তাকে।

মনিরা এবার দারওয়ানকে লক্ষ্য করে বললো—একে অন্তপুরে নিয়ে যত্ন সহকরে বসতে দাও এবং ভাল খাবার আর ঠান্ডা পানি দাও।

এবার রহমান মরিয়া হয়ে উঠলো, বৌরাণী তাকে এইভাবে জব্দ করবেন ভাবতে পারেনি সে। বাধ্য হয়েই রহমান দারওয়ানকে অনুসরণ করলো।

মনিরা চলে গেলো উপরে।

বনহুর তখন সোফায় বসে আপন মনে সিগারেট পান করছিলো।

মনিরা এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

বনহুর বললো—দরবেশ বাবা গেছে?

না।

তবে কি চায় সে?

ঠান্ডা পানি।

অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর —ঠান্ডা পানি পান করতেই---

হাঁ, ঠান্ডা পানি পান করতেই এসেছিলো সে।

দিয়েছো?

না।

পানি পান করতে দাওনি?

শুধু পানি নয়, সরবৎ এবং খানাও দেবো বলে অন্তপুরে এনেছি।

তুমি দেখছি--

হাঁ, তোমার চেয়েও চালাক মনে রেখো।

এতে আবার চালাক-অচালাকের কি এলো?

চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মত বসে থাকো, আমি এক্ষুণি আস্ছি। চলে যায় মনিরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে।

বনহুরের মুখে এক টুকরা হাসি ফুটে উঠে, পুনরায় আর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে সোফায় দেহটা এলিয়ে দেয়।

মনিরা বয়ের হাতে খাবারের থালা আর নিজের হাতে ঠান্ডা পানি নিয়ে হাজির হয় দরবেশ বাবাজীর সম্মুখে।

দরবেশ বাবা মাথা নিচু করে বসে ছিলো, পদশব্দে মুখ তুলে তাকায়।

মনিরা বয়ের হাত থেকে খাবারের থালা নিয়ে এবং পানির গেলাসটা দরবেশের সম্মুখে রেখে পাশে বসে—খাও বাবা।

রহমান বাধ্য হয়ে খেতে শুরু করে।

মনিরা বলে—দরবেশ বাবা, একটা কথা বলবো, দয়া করে শুনবে?

হাঁ মা, শুনবো। খেতে খেতে বলে দরবেশ বাবা।

এক সময় খাওয়া শেষ হয়, এখন অনেকটা ভয় কেটে গেছে রহমানের। বৌরাণী ঠিক তাকে চিনতে পারেননি তাহলে। প্রতীক্ষা করে কি বলতে চান তাদের বৌরাণী।

মনিরা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে আসে, বলে সে—দরবেশ বাবাজী, আমার স্বামী মোটেই সংসারী নয়, তাকে আমি কিছুতেই ধরে রাখতে পারি না। তুমি যদি দয়া করে... ...

রহমানের মুখ খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠে, এতোক্ষণ বুকের মধ্যে তার যে একটা ভীষণ ঝড় বইছিলো তা শান্ত হয়ে আসে। বলে সে—হাঁ মা, ঠিক আমি ধরেছি তোমার মনের কথা। সত্যি তুমি স্বামীভাগ্যা নারী কিন্তু ঐ একটা ব্যাপারে তুমি সুখী নও। দেখি মা তোমার দক্ষিণ হাতখানা?

মনিরা তার দক্ষিণ হাতখানা মেলে ধরলো দরবেশ বাবার সম্মুখে।

দরবেশ-বেশী রহমান মনিরার হাত স্পর্শ করার সাহসী হলো না, সে হাতখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললো— মা, তুমি বড়ই ভাগ্যবতী নারী। তোমার একমাত্র পুত্র ভবিষ্যতে মস্তবড় নামকরা একজন ব্যক্তি হবে। যেমন তোমার স্বামী বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি.........

মনিরা চট করে হাতখানা সরিয়ে নিলো।

রহমান বুঝতে পারলো, মনিরা ভয় পেয়েছে কারণ তার হাতের রেখায় যদি ধরা পড়ে যায় তার স্বামী বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ দস্যু।

মনিরা হাত সরিয়ে নিতেই দরবেশ বলে উঠলো— আমি তোমাকে একটা তাবিজ দেবো মা। তুমি ঐ তাবিজখানা তোমার স্বামীর হাতের কব্জায় বেঁধে দেবে। তারপর দেখবে সে কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে দূরে থাকবে না।

হাত পাতলো মনিরা— কই দাও।

দরবেশ তার ঝোলার মধ্য হতে বের করে আনলো একটা তাবিজ, বেশ বড় তাবিজটা। মনিরার হাতে দিয়ে বললো— এই নাও। কিন্তু খবরদার, এ তাবিজের গুণাগুণ তোমার স্বামী যেন জানতে না পারে! জানলে অমঙ্গল হবে।

মনিরা ঘাড় কাৎ করে বললো— আচ্ছা, সে জানবে না।

রহমান এবার নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো, মনিরাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলো সে। অনেক কষ্টে কার্যোদ্ধার হলো তার।

দরবেশ চলে যেতেই মনিরা তাবিজটা হাতের মুঠায় লুকিয়ে পা টিপে টিপে স্বামীর পিছনে এসে দাঁড়ালো। বনহুর কিন্তু ঘুমের ভান করে চোখ দুটো বন্ধ করে ছিলো। মনিরা আর দরবেশের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলছিলো তখন বনহুর তাদের অলক্ষ্যে আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো এবং শুনেছিলো সব কথা ওদের। মনিরা ফিরে আসবার পূর্বেই বনহুর তার স্বস্থানে এসে সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমের ভান করে রইলো।

মনিরা স্বামীকে সত্যি সত্যি নিদ্রিত ভেবে অতি সতর্কতার সঙ্গে তাবিজখানা সূতায় বেঁধে পরিয়ে দিলো স্বামীর বাজুতে। তারপর ডাক দিলো— শুনেছো, ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?

ঘুম থেকে জেগে উঠার মতই চোখ মেলে বনহুর সোজা হয়ে বসে বলে—মাফ করো মনিরা, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তা এতোক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?

দরবেশ বাবাজীর কাছে।

সর্বনাশ! এতোক্ষণ কি করছিলে সেখানে?

একটা তাবিজ নিলাম।

আশ্চর্য হবার ভান করে বলে বনহুর— তাবিজ!

হাঁ, একটা তাবিজ নিয়েছি।

কিন্তু কি করবে তাবিজ দিয়ে?

তোমার জন্যই তো তাবিজ নিলাম।

আমার জন্য?

হাঁ।

তার মানে?

মানে তুমি কত জায়গায় যাও, কত সময় কতরকম বিপদে পড়ো তাই ঐ তাবিজ দিলেন দরবেশ বাবা। ওটা তোমার হাতের বাজুতে বাঁধা থাকলে বিপদ তোমার কাছে আসবে না, বুঝলে?

বুঝলাম? কিন্তু কোথায় তোমার সেই তাবিজ বলো তো?

তোমার বাজুতে বেঁধে দিয়েছি।

চমৎকার! গম্ভীর হয়ে কথাটা বললো বনহুর।

মনিরা হেসে বললো— কেন, মন্দ কি হয়েছে বলো?

আচ্ছা, এতোবড় একটা তাবিজ আমি হাতে বেঁধে ঘুরে বেড়াবো, লোকে বলবে কি বলো তো?

লক্ষ্মীটি, লোকে কিছু বলবে না। তা ছাড়া জামার নিচে পরা থাকবে, দেখবেই বা কি করে অন্যে?

বনহুর নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো। একটা স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের ফাঁকে।

মনিরার আনন্দ আর ধরে না, স্বামীকে সে এবার তাবিজের জোরে সব সময় কাছে পাবে।

☐

গভীর রাত।

সমস্ত বাড়িখানা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে।

পাশের খাটে নূর ও মনিরা ঘুমাচ্ছে। নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে ওদের। বনহুর তার বিছানা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো।

অতি সন্তর্পণে পাশের কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলো। কক্ষমধ্যে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে নিলো এবার সে। চারিদিকের জানালাগুলি অতি সাবধানে বন্ধ করে দিলো তারপর মেঝের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। খুলে ফেললো বাজু থেকে তাবিজটা।

বনহুর তাবিজটা খুলে হাতের মুঠায় নিয়ে একপাশে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে তাবিজের ঢাকনা খুলে গিয়ে বেরিয়ে এলো ক্ষুদে একটা ওয়্যারলেস।

বনহুর মুখের কাছে তুলে ধরেই ডাকলো— রহমান... হ্যালো রহমান...

অল্পক্ষণেই রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ হলো বনহুরের, কথা শুরু হলো উভয়ের মধ্যে।

বললো বনহুর— কি সংবাদ নিয়ে তুমি তখন এসেছিলে রহমান?

ওপাশ থেকে শোনা যায় রহমানের গলা— সর্দার, একটা দুঃসংবাদ নিয়েই আমি তখন হাজির হয়েছিলাম।

বুঝতে পেরেছিলাম, বিনা কারণে তুমি আসোনি। তা বলো কি সেই দুঃসংবাদ?

সর্দার, মরিলা দ্বীপে এক ভয়ঙ্কর কাপালিকের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রতিদিন সে বহু লোককে হত্যা করে রক্ত পান করে। শুধু মরিলা দ্বীপই নয়, আশেপাশে অনেক শহর-বন্দরের লোককেও সে হত্যা করে চলেছে....

বলো কি রহমান?

হাঁ সর্দার, আপনাকে না জানিয়ে আমি, কায়েস এবং আরও কয়েকজন মিলে গিয়েছিলাম মরিলা দ্বীপে কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। অনেক সন্ধান করেও এই ভয়ঙ্কর কাপালিকটাকে খুঁজে পাইনি। সর্দার, সেখানে আমাদের একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

দুর্ঘটনা ঘটে গেছে!

আমাদের একজনকেও কাপালিক হত্যা করেছে।

এতোবড় একটা ঘটনা জানাওনি কেন এতোদিন?

সর্দার, সুযোগ হয়নি। বিশেষ করে বৌরাণীর সূতীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে আপনার নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হইনি।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে বনহুর— আমাদের মধ্যে কে নিহত হয়েছে তার নাম বলো?

সর্দার, আমাদের বিশ্বস্ত অনুচর শহীদ খান নিহত হয়েছে। তার মস্তকহীন দেহটা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। আস্তানায় নিয়ে এসে সমাধিস্থ করেছি।

আমি আজই আসছি। তুমি তাজ আর দুলকী নিয়ে ভোরের দিকে হাজির হও....

না। আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

চমকে ফিরে তাকায় বনহুর, কখন যে মনিরা তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো, একটুও টের পায়নি বনহুর। স্ত্রীকে দেখে মুহূর্তের জন্য একটু ভড়কে গেলেও সামলে নিলো সে। সঙ্গে সঙ্গে বললো— সব তো শুনলে মনিরা, বলো এই অবস্থায় আমি কেমন করে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি?

মনিরা তখন রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, বারবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে সে বনহুরের হাতের মুঠায় সেই তাবিজখানার দিকে, যে তাবিজখানাকে বিশ্বাস করে সে নিজ হস্তে বেঁধে দিয়েছিলো স্বামীর হাতে। দরবেশ যে ছদ্মবেশী রহমান, এতোক্ষণে ফাঁস হয়ে গেছে তার কাছে। অধর দংশন করে মনিরা, স্বামীর হাতের মুঠা থেকে তাবিজ আকারে ওয়্যারলেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে বলে— দাও, ওটা আমি ভেঙ্গে গুড়ো করে ফেলবো। ওটার জন্য আবার আমি তোমাকে হারাবো....

মনিরার কথা শুনে এবং তাবিজটার প্রতি ভয়ানক রাগ দেখে হাসে বনহুর, বলে সে— মনিরা, লক্ষ্মীটি, শোনো, তুমি যা চেয়েছো তাই পাবে। আমি ঠিক সংসারী হয়েছি.....

তাহলে আবার চলে যাবে কেন?

না গিয়ে এখন যে কোনো উপায় নেই মনিরা। কোনো এক কাপালিক প্রতিদিন শত শত লোকের জীবন নাশ করে চলেছে। যদি তাদের বাঁচাতে পারি....

তা হবে না। ওদের বাঁচাতে গিয়ে তুমিই যদি বিপদে পড়ো তখন কি হবে?

মনিরা, তোমাদের দোয়া আমার রক্ষাকবচ। যত বিপদেই পড়ি, অসীম করুণাময় আমাকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করে নেন। তুমি আমাকে ছুটি দাও মনিরা.... বনহুর মনিরার হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে।

মনিরা নিরুপায়, স্বামীর কাতর কণ্ঠস্বর তার কাছে বড় করুণ লাগে। কঠিন হতে চাইলেও কঠিন হতে পারে না। মনিরার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে নিজের হাতে ওর চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে...ছিঃ কেঁদো না মনিরা। তোমার চোখে পানি দেখলে আমার মনটা অস্থির হয়ে পড়ে।

মনিরা স্বামীর প্রশস্ত বুকে মুখ লুকিয়ে আরও জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে। কিছুতেই সে নিজকে স্থির রাখতে পারে না। ভাবে মনিরা, কত আশা নিয়ে সে চেয়েছিলো স্বামীকে নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তুলবে, কত সাবধানতার সঙ্গেই না সে স্বামীকে নজরে নজরে রেখেছিলো। ভয় ছিলো, না জানি কখন কোন্ ফাঁকে আবার পালিয়ে যাবে সে। কিন্তু সব তার ব্যর্থ হলো, স্বামীকে পারলো না সে ধরে রাখতে, আবদ্ধ রাখতে পারলো না সংসারের গন্ডিসীমার মধ্যে।

ভোর হবার পূর্বেই স্বামীকে বিদায় দিতে হলো মনিরার। রহমান নিজে দুলকীতে চেপে তাজসহ এসেছিলো।

মনিরার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বনহুর। ভোরের আধো অন্ধকারে শুধু শোনা যায় অশ্বখুরের শব্দ খট্ খট্ খট্...

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই নূর পিতার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গোটা বাড়িখানা খুঁজে ফিরে আসে মায়ের পাশে, গম্ভীর ভারী গলায় বলে— আম্মি, আব্বুকে দেখছি না কেন? আব্বু কোথায় বলো না?

মনিরার বুক ফেটে কান্না আসছিলো, পুত্রের প্রশ্নের কোনো জবাব সে দিতে পারছিলো না।

নূর তবু প্রশ্ন করে চলেছে—আম্মি, বলো না আব্বু কোথায়?

বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললো মনিরা— তোমার আব্বু বাইরে গেছেন নূর।

কখন আসবেন আব্বু?

কাজ শেষ হলেই চলে আসবেন।

আম্মি, তুমি না বলেছিলে, আব্বুকে আর যেতে দেবে না?

তা কি হয় বাবা! পুরুষ মানুষকে কোনোদিন ধরে রাখা যায় না।

আমি তো যাইনা আম্মি?

তুমিও যখন তোমার আব্বুর মত হবে তখন তোমাকেও আমি ঘরে আটকে রাখতে পারবো না নূর।

না আম্মি, আমি কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। আব্বুর মত চলে যাবো না দেখো।

আচ্ছা বাবা, তুমি আমার বুক জুড়ে থেকো.... মনিরা পুত্রকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

ওদিকে বনহুর আর রহমান তখন কান্দাই আস্তানায় ফিরে এসেছে।

রহমান আর বনহুর আস্তানার ভিতরে প্রবেশ করতেই ছুটে আসে নূরী—হুর, তুমি এসেছো? ভুলে যায় নূরী রহমানের উপস্থিতি, বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে—সত্যি, এ ক'দিন যে তোমাকে ছাড়া কেমন করে কাটিয়েছি, তুমি বুঝবে না হুর।

রহমান সেই ফাঁকে চলে যায় সেখান থেকে। সর্দার আর নূরীর এই মিলন মুহূর্তে সে নিজকে সরিয়ে রাখে।

বনহুর আর নূরী বিশ্রামকক্ষে এসে দাঁড়ালো।

নূরী অশ্রুসিক্ত নয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো— হুর, আমি তোমাকে যেতে দেবো না! কাপালিক তোমাকেও হত্যা করে ফেলবে.....

বনহুর হেসে উঠে খুব জোরে, সে হাসি যেন থামতে চায় না।

নূরী অবাক হয়ে যায় বনহুরের এই অহেতুক হাসি দেখে, ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে থাকে সে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে নারীজাতি এমনিই হয়। মনটা তাদের এতো দুর্বল যেন তুলোর চেয়েও নরম। একটুতেই ভয়ে মুষড়ে পড়ো তোমরা নূরী।

বনহুর পায়চারী শুরু করলো, তার মনের আকাশে আর একটি অশ্রুসজল মুখ ভেসে উঠছিলো বারবার। বললো আবার বনহুর— তোমাদের চোখের অশ্রু কোনোদিনই বাঁধ সাদতে পারবে না আমার চলার পথে, বুঝলে নূরী! বাধা দিয়ে কোনো ফল হবে না।

হুর! অস্ফুট কণ্ঠে বললো নূরী।

নূরী, আমার কঠিন মনের সঙ্গে তোমার নিজেদের মনকেও কঠিন করে নাও। বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে—

নূরী ঘাড় কাৎ করে বলে— আচ্ছা, আর তোমাকে বাধা দেবো না।

বনহুর নূরীকে টেনে নেয় কাছে।

বাইরে থেকে শোনা যায় রহমানের গলা— সর্দার, সব প্রস্তুত হয়ে গেছে।

বনহুর তার ড্রেস পরিবর্তন কক্ষে প্রবেশ করে এবং দ্রুতহস্তে জমকালো দস্যুড্রেসে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসে সে।

নূরী গম্ভীর মুখে বসে ছিলো সোফায়, বনহুর এসে দাঁড়ায় তার পাশে, ওর মুখটা তুলে ধরে বলে— দস্যুকন্যা তুমি। তোমাকে এমন গম্ভীর মুখে বসে থাকা সাজে না নূরী। হাসো, হাসো নূরী। তোমার হাসিমুখ আমাকে সব সময় আনন্দ-উচ্ছল রাখবে।

নূরী পারে না হাসতে, বনহুর চলেছে এক দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর নরখাদক কাপালিকের সঙ্গে মোকাবেলা করতে। এই মুহূর্তে কি করে হাসবে নূরী! নূরী বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে— যাও হুর, আমি খুশিমনে তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, তোমার নূরী তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রইলো।

বনহুর নূরীর গণ্ডে তার বলিষ্ঠ ওষ্ঠদ্বয়ের রক্তাভ ছাপ এঁকে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

❑

মরিলা দ্বীপে পৌছে বনহুর মুগ্ধ হলো। দ্বীপটা বড় সুন্দর আর মনোরম। কতকটা কাশ্মীরের মত মনে হয়। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে উঁচুনীচু জায়গা। কোথাও বা বেশ সমতল আবার কোথাও খুব উঁচু। মাঝে মাঝে টিলা আর ঝোপঝাড়। বড় বড় পাথরখন্ড ছড়িয়ে আছে গোটা দ্বীপময়।

দ্বীপের দক্ষিণে গাঢ় জঙ্গলে পূর্ণ।

এদিকে কোনো লোকালয় নেই, শুধু টিলা আর ঘন বন।

দ্বীপের উপর যেসব বাড়িঘর রয়েছে সেগুলো পাথর আর কাঠের তৈরি। সুন্দর করে এসব ঘরবাড়ি বানানো হয়েছে। কোথাও বা ঘন বসতি আবার কোথাও বেশ পাতলা। দ্বীপটা ছোট নয়—অনেক বড়, লোকসংখ্যাও অনেক বেশি।

মরিলা দ্বীপটা যেমন সুন্দর তেমনি দ্বীপের অধিবাসিগণ আরও সুন্দর। ধবধবে সাদা এদের গায়ের রং, মাথার রেশমের মত লালচে চুল। চোখগুলো ঘোলাটে ধরনের।

মেয়েগুলো আরও সুন্দর। লন্ডন বা আমেরিকার মেয়েদের মত নয়, চেহারার মধ্যে বেশ লাবণ্যতা আছে। চুলগুলো রেশমের মত কিন্তু ঘন আর কোঁকড়ানো। চোখগুলো ঘোলাটে হলেও চাহনি মায়াময়। রং ধবধবে হলেও গোলাপী আভা জড়ানো।

পুরুষরা কুঁচি দেওয়া ঢিলা পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে। মেয়েরা গারার, কেউ বা ঘাগড়া আর ওড়না পরে। মাথায় এক ধরনের টুপি পরে পুরুষ এবং মেয়ে উভয়েই।

মেয়েদের চুল কালো লম্বা, কারো বা খাটো।

দ্বীপে পৌছেই বনহুর বুঝতে পেরেছে এখানের জনগণের মধ্যে ভীষণ একটা আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে, সবাই যেন প্রাণ বাঁচানোর জন্য উন্মুখ। কেউ কারো দিকে চাইতেও যেন শিউরে উঠে। জোরে কেউ কথা বলে না, কেমন যেন ফিসফিস করে কথা বলে সবাই।

বনহুর আর রহমান একটা হোটেলে উঠেছে। সমস্ত দিন ওরা দু'জন গোটা দ্বীপটা ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো। অবশ্য যতদূর পায়ে হেঁটে এগুতে পারলো অতদূরই যাওয়া সম্ভব হলো ওদের।

মরিলা দ্বীপের যেদিকটা ঘন বনে ঢাকা সেইদিকেই এগুচ্ছিলো ওরা।

পথচারিগণ তাদের বাধা দিয়ে বলেছিলো— তোমরা কি জানো না ঐ দিকে কাপালিক রাক্ষস আছে? হত্যা করে তোমাদের রক্ত শুষে খাবে সে।

বনহুর বলেছিলো— আমি কাপালিকের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি।

কথাটা শুনে হেসেছিলো পথচারিগণ, কিন্তু সে হাসি ছিলো ব্যথাকরুণ আর দুঃখময়।

রহমান আঁচ করে নিয়েছিলো, মনে মনে শিউরে উঠেছিলো সে। কিন্তু ফিরার যে আর কোনো উপায় নেই। যেমন করে হোক নরখাদক কাপালিককে হত্যা করতেই হবে।

বনহুর আর রহমান সন্ধ্যা অবধি এগুলো।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে মরিলা দ্বীপটা যেন কোনো যাদুকরের মায়াকাটির স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়লো।

আর এগুবে কি না ভাবছে বনহুর।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছে রহমান— এতোবড় একটা দ্বীপ মুহূর্তে কিভাবে নীরব হয়ে পড়লো! কোথাও জনপ্রাণী নেই, পথঘাট সম্পূর্ণ নিশ্চুপ, নিস্পন্দ।

প্রতিটা বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। দোকানপাট সব বন্ধ হলো। যানবাহন সব যেন হাওয়ায় উবে গেছে এক নিমিশে। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব জেগে উঠলো।

বনহুর আর রহমান এবার হোটেলের দিকে পা চালালো। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমান্বয়ে জমাট বেঁধে উঠছে। উভয়েরই দেহে জমকালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, কোমরের বেল্টে গুলীভরা রিভলভার।

বনহুর আর রহমান এখন যে পথে এগুচ্ছিলো সে পথ ঘন জঙ্গলের পাশ দিয়েই এগিয়ে গিয়েছে লোকালয়ের দিকে।

পথ শুধু জনহীনই নয়, একেবারে ছমছমে অন্ধকারে ভরা। মাঝে মাঝে লাইটপোষ্ট আছে, কিন্তু সে সব লাইটপোষ্টে গ্যাসলাইট জ্বালানো হয়নি।

আর কারই বা এমন সাহস আছে যে লাইটপোষ্টে মই লাগিয়ে গ্যাসলাইটে গ্যাস ভরে আলো জ্বালাবে। সন্ধ্যার অনেক পূর্বে সবাই যার যার জীবন বাঁচিয়ে ঘরে লুকিয়ে পড়েছে।

বনহুর আর রহমান দ্রুত পা চালাচ্ছিলো।

আকাশে তারার প্রদীপ জ্বলে উঠলেও পৃথিবীর অন্ধকার কমেনি একটুও। চাঁদ উঠবে না কয়েক প্রহরের জন্য।

রহমান বললো—সর্দার, কেমন একটা শব্দ হচ্ছে।

হাঁ, শুনতে পাচ্ছি, পাশের জঙ্গলে ভারী কোনো জন্তুর পায়ের শব্দ বলে মনে হচ্ছে।

রহমান বললো—সর্দার, পা চালিয়ে চলুন।

কেন, তোমার শরীর ছমছম করছে নাকি?

অহেতুক জীবননাশ হতে পারে... ...

অবশ্য সে কথা মিথ্যা নয়। না জানি আজ ভাগ্যে কি আছে। হোটেলে পৌঁছবো কিনা সন্দেহ।

বনহুরের কথা শেষ হয় না, একটা আর্তনাদ ভেসে আসে পাশের জঙ্গল থেকে। মানুষের গলার আওয়াজ।

বনহুর আর রহমান থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রহমান বললো— সর্দার, নিশ্চয়ই কাপালিকের কবলে কেউ প্রাণ হারালো।

বনহুর বললো— হাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো রহমান।

ঐ শুনুন সর্দার, মানুষের মাথাটা কেটে নেবার পর যেমন রক্তের সোঁ সোঁ শব্দ হয় তেমনি শব্দ হচ্ছে।

বনহুর বললো— একেবারে কাছেই কোথাও শয়তান কাপালিক কাউকে হত্যা করলো বলে মনে হচ্ছে।

বনহুর আর রহমানের মধ্যে অত্যন্ত নিম্নস্বরে আলাপ হচ্ছিলো।

এবার বনহুর কোমরের বেল্ট হতে রিভলভারখানা দ্রুতহস্তে খুলে নিলো, জঙ্গলে প্রবেশ করবার জন্য অগ্রসর হতেই রহমান তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো—প্রাণ গেলেও আমি আপনাকে এই ঘন অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে দেবো না।

রহমান, বাধা দিও না, হয়তো সম্মুখেই কাপালিকটাকে পাবো।

সর্দার, দিনের আলোতে আপনি কাপালিকের সন্ধানে এই জঙ্গলে প্রবেশ করবেন কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। চলুন সর্দার এখান থেকে।

বনহুর রহমানের কথাটা ফেলতে পারলো না। সত্যিই পাশের জঙ্গলে তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। পথটা ঠিক জঙ্গলের পাশ কেটেই এগিয়ে গেছে সম্মুখের নগর বা লোকালয় অভিমুখে।

আজকের মত বনহুর নিজকে সংযত করে নিলো। রহমানসহ পা বাড়ালো আগের দিকে।

কিন্তু কয়েক পা এগুতেই সামনে পথে কোনো একটা বস্তুর সঙ্গে হোঁচট খেলো রহমান। চমকে ঝুঁকে পড়তেই শিউরে উঠলো সে ভীষণভাবে। পথের উপর পড়ে আছে একটা মস্তকহীন নরদেহ। যদিও অন্ধকার তবু বেশ বুঝা যাচ্ছে, মস্তকহীন গলা থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুর বললো— কি হলো রহমান?

চাপা স্বরে বললো রহমান—সর্দার, মস্তকহীন দেহ!

বনহুর ঝুঁকে পড়লো— একটু পূর্বে এই হতভাগ্যই কাপালিক-হস্তে প্রাণ দিয়েছে... ...

বনহুরের কথা শেষ হয় না, একটা জমকালো মূর্তি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে, সে কি ভীষণ আকার এক মনুষ্যদেহ! অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝা গেলো, ঐ জমকালো মনুষ্য-দেহটাই কাপালিক শয়তান।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলী ছুঁড়লো জমকালো মূর্তিটা লক্ষ্য করে। একটি নয়, পর পর দু'টি— কিন্তু আশ্চর্য! কাপালিকটা সঙ্গে সঙ্গে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অন্তর্ধান হয়েছে।

রহমানের চোখে বিস্ময়, সে জানে— তার সর্দারের কোনোদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

বনহুর বললো— শয়তান পালিয়েছে।

চলুন সর্দার, ফিরে যাওয়া যাক্।

চলো।

❑

বনহুর আর রহমান হোটেলে ফিরে এলে হোটেলের মালিক তাদের জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করলো। মালিক তাদের ফিরতে বিলম্ব দেখে ভীষণভাবে ভয় পেয়েছিলো।

হোটেলের মালিকের কড়া হুকুম, সন্ধ্যার পর কেউ তার হোটেল থেকে বাইরে বের হতে পারবে না। প্রতিটি ক্যাবিনে মালিক নিজে গিয়ে সন্ধান করে দেখে, কোনো ক্যাবিনের লোক এখনও বাইরে আছে কিনা।

মালিক লোকটি অত্যন্ত ভালোমানুষ, তার হোটেলের প্রত্যেককে সে ভালোবাসে, সমাহ করে। তার হোটেলে থাকাকালীন কারো যেন কোনো কষ্ট বা অসুবিধা না হয় সেদিকে তার সূতীক্ষ্ণ নজর আছে।

মরিলা দ্বীপে এই হোটেলটার সুনাম আছে। বিশেষ করে মালিক ভালো, হোটেলের ব্যবস্থাও ভালো। দ্বীপে কাপালিক নরখাদকের আবির্ভাব ঘটবার পর থেকে বহুলোক প্রাণ হারিয়েছে কিন্তু এ হোটেল থেকে আজও কেউ উধাও হয়নি। মালিকের সাবধানতার ফলেই কাপালিক এখনও এ হোটেলের কাউকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি।

আজ তার হোটেলে অবস্থানরত দু'জন যখন সন্ধ্যার পরও ফিরে এলো না তখন একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছিলো মালিক হাউবার্ড। এমন তো আর তার হোটেলে হয়নি। সন্ধ্যার পূর্বেই হাউবার্ড। হোটেলের নেইম-লিষ্ট নিয়ে প্রত্যেকটা ক্যাবিনে গিয়ে সন্ধান করে দেখতো, সবাই ঠিক আছে কিনা। কেউ না থাকলে তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান চালিয়ে তাকে হোটেলে আনা হতো। তার হোটেলের যেন কোনো বদনাম না হয় সেদিকে ছিলো হাউবার্ডের সতর্ক দৃষ্টি।

রহমান আর বনহুর যতোক্ষণ বাইরে ছিলো ততোক্ষণ হাউবার্ডের উদ্বিগ্নতার সীমা ছিলো না। নিজে সে ব্যস্ত হয়ে হোটেলের ব্যালকুনিতে পায়চারী করছিলো। ওরা যখন সুস্থ দেহে ফিরে এলো তখন খুশির আবেগে জড়িয়ে ধরলো, কতবার যে বনহুর আর রহমানের কপালে চুম্বন করলো তা বলা যায় না।

বনহুর আর রহমান হাউবার্ডের আচরণে খুশি হলো অনেক। তাকে ধন্যবাদ জানালো ওরা।

রাতের মত খানাপিনা সেরে শুয়ে পড়লো বনহুর আর রহমান।

পাশাপাশি দুটি বিছানায় শুয়ে উভয়ে।

বনহুর চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট পান করছিলো আর গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলো।

রহমান হঠাৎ কোনো প্রশ্ন করার সাহসী হচ্ছিলো না। সেও শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো কত কথা। বিশেষ করে রহমানের মনে তখন সন্ধ্যার সেই মস্তকহীন লাশটা ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কি ভয়ঙ্কর নৃশংস হত্যাকান্ড!

বনহুর একসময় বলে উঠলো— রহমান, এই হোটেলে অবস্থান করে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। কারণ হোটেলের মালিক হাউবার্ডের দৃষ্টি এগিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে।

সর্দার, আমিও সেইরকম ভাবছি। আজই আমাদের সামান্য বিলম্বে হাউবার্ড যেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলো!

হাঁ, তুমি অন্য কোনো হোটেলে আমাদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করো। আমাদের কাজ শুধু দিনে নয়, রাতের অন্ধকারেও চলবে। কাপালিকটাকে যতক্ষণ শায়েস্তা না করেছি ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

❑

ঘুমিয়ে পড়েছে বনহুর ও রহমান। হঠাৎ একটা আর্তচিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যায় উভয়ের। বনহুর শয্যায় উঠে বসতেই রহমান অকস্মাৎ ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলো— সর্দার, ঐ জানালার দিকে তাকান... আংগুল দিয়ে দেখানো সে সম্মুখস্থ একা জানালার দিকে।

বনহুর ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠলো, জানালার পাশ থেকে সা করে সরে গেলো একটা ভয়ঙ্কর মুখ। ক্ষণিকের জন্য হলেও বনহুর দেখলো, জমকালো একখানা মুখ, মুখে বিরাট লম্বা লম্বা দাড়ি আর গোঁফ। ভ্রুগুলো ঘন আর মোটা, ঝুলে নেমেছে চোখের উপর। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটার মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মাথায় রাশিকৃত ঝাকড়া চুল, মাঝে মাঝে

জট ধরে গেছে বলে মনে হলো। দাড়ি-গোঁফগুলোর ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছিলো বড় বড় সাদা ধবধবে দাঁত। কিন্তু বনহুর এক দণ্ডেই আরও লক্ষ্য করেছিলো, দাড়ি-গোঁফ আর সাদা দাঁতগুলো তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। কি ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য!

বনহুর বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা টেনে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। কিন্তু কোথাও আর কিছু নজরে পড়লো না।

বনহুর জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো, ততক্ষণে রহমান ও আরও অন্যান্য লোক এসে পড়েছে সেখানে, তাদের মধ্যে হোটেলের মালিক হাউবার্ডও আছেন। তিনি তো ভয়ে হাউমাউ করে কাঁদছেন।

বনহুর হোটেলের একজন কর্মচারীকে একটা লণ্ঠন আনতে বললো।

লণ্ঠন এলে সবাই লণ্ঠনের আলোতে দেখলো, জানালাটার পাশে খোলা বারান্দায় ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত পড়ে আছে।

রক্তের চিহ্ন ক্রমান্বয়ে এগিয়ে গেছে পিছনের ব্যালকুনির দিকে।

বনহুর বিলম্ব না করে দক্ষিণ হস্তে গুলীভরা রিভলভার আর বাম হস্তে লণ্ঠন নিয়ে রক্তের ফোঁটাগুলো লক্ষ্য করতে করতে পিছন ব্যালকুনির দিকে এগুলো।

বনহুর পা বাড়াতেই হাউবার্ড জড়িয়ে ধরলো তাকে— তুমি ওদিকে যেও না যেও না বলছি...

বনহুর গম্ভীর গলায় বললো— বাধা দিবেন না, আমি দেখছি কোন্ দিকে গিয়েছে সেই নরখাদক।

হাউবার্ড তো নাছোড়বান্দা, সে আরও সবলে জড়িয়ে ধরলো যেও না, তোমাকেও মেরে ফেলবে।

বনহুর কোনোরকমে হাউবার্ডের হাত থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে রক্তের ছাপ লক্ষ্য করে দ্রুত এগুলো। রক্তের চিহ্ন ব্যালকুনি অবধি গিয়ে নিচে নেমে গেছে। অবাক হলো বনহুর, সিঁড়ি নেই অথচ কাপালিক কোন্ পথে উধাও হলো? হাওয়ায় উড়ে গেলো নাকি?

এতোক্ষণ যে রক্তের ফোঁটা লক্ষ্য করে বনহুর দ্রুত এগিয়ে এসেছিলো সে রক্ত যে কোনো নরমুণ্ডের তাতে কোনো ভুল নেই। কাপালিক নিশ্চয়ই

কাউকে হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তকটা এই পথে নিয়ে পালিয়ে গেছে, যাবার সময় উঁকি দিয়েছিলো তাদের কামরার জানালার পথে।

হতাশ হয়ে ফিরে এলো বনহুর রিভলভার আর লণ্ঠন হাতে।

হাউবার্ড বনহুরকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগলো, ভাগ্যিস, তাকে কাপালিক হত্যা করে ফেলেনি তাই রক্ষা।

বনহুর হাউঝার্ডের হাত থেকে নিজকে উদ্ধার করে নিয়ে বললো— চলুন দেখি, কার মস্তকহীন দেহ আপনার হোটেলে পাওয়া যায়!

ভয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো হাউবার্ড— বলো কি, আমার হোটেলে মস্তকহীন দেহ...সর্বনাশ, এ কখনো হতে পারে না।

আমার হোটেলে মস্তকহীন দেহ থাকতে পারে না কিছুতেই...

বনহুর বললো— আপনার হোটেলেই কেউ খুন হয়েছে।

খুন! ...দু'চোখ কপালে তুলে বললো হাউবার্ড।

বনহুর বললো— দেখছেন না তাজা রক্তের ছড়াছড়ি।

মিথ্যা কথা। আমার হোটেলে খুন হতে পারে না কিছুতেই।

চলুন দেখছি... ... বনহুর লণ্ঠন হাতে রক্তের চিহ্ন লক্ষ্য করে হোটেলের বারান্দা ধরে অগ্রসর হলো।

বনহুরের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললো হোটেলের মালিক হাউবার্ড এবং অন্যান্য সবাই।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে সবার মুখ।

এমন কি রহমানের মুখমন্ডলেও ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেও সকলের সঙ্গে বনহুরের পিছনে পিছনে অগ্রসর হচ্ছিলো।

কয়েকখানা ক্যাবিন পেরিয়ে রক্তবিন্দুগুলো একটা ক্যাবিনে প্রবেশ করেছে। আশ্চর্য, রক্তের ফোঁটা দরজা দিয়ে ভিতরে না গিয়ে পাশের জানালা দিয়ে ভিতরে চলে গেছে।

বনহুর এবং অন্যান্য সবাই এসে জানালাটার পাশে দাঁড়ালো। সকলের মুখই রক্তশূন্য ফ্যাকাশে। জানাল্লার দিকে হতভম্বভাবে তাকিয়ে আছে সবাই।

বনহুর বললো— দরজা বন্ধ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। এই জানালা পথেই কাপালিক প্রবেশ করেছিলো ভিতরে।

হাউবার্ড জোরে রোদন করতে শুরু করলো, সে ভয়ে কাঁপছে, না জানি ভিতরে কাকে হত্যা করা হয়েছে।

বনহুরের আদেশে রহমান জানালাপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে ক্যাবিনের দরজা খুলে দিলো।

দরজা মুক্ত হতেই বনহুর সর্বাগ্রে ভিতরে প্রবেশ করলো, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলে ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই ভয়ে শিউরে উঠলো। বনহুরের হস্তস্থিত লণ্ঠনের আলোতে দেখতে পেলো ওরা— বিছানায় শায়িত একটি মস্তকহীন দেহ পড়ে আছে। রক্তে লালে লাল হয়ে গেছে বিছানাটা।

হাউবার্ড তো চিৎকার করে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলো মেঝেতে।

বনহুর হোটেলের অন্যান্য কর্মচারীকে বললো— এই, তোমরা একে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও। তারপর চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করোগে।

বনহুরের আদেশে কয়েকজন লোক হাউবার্ডের সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

এবার বনহুর মস্তকহীন মৃতদেহটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। লোকটা বেশ মোটাসোটা, বয়স ঠিক আন্দাজ করা কঠিন তবে মধ্যবয়সীই বলে মনে হলো। দেহে মরিলা দ্বীপবাসীদের নাইট ড্রেস পরা রয়েছে। বনহুর ভালোভাবে লক্ষ্য করলো, কোনো সূতীক্ষ্ণ খর্গ দ্বারা লোকটার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে। গলার কাছে খানিকটা মাংস তখনও কেঁপে কেঁপে নড়ছে। দেহটা যদিও সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেছে।

বনহুর ঝুঁকে পড়ে লণ্ঠনের আলোতে মৃতদেহটা পরীক্ষা করে দেখে এবার তাকালো মেঝের দিকে। তাকিয়েই বনহুর বিস্ময়ে অস্ফুট আওয়াজ করে উঠলো— সর্বনাশ... ...একি, মানুষের পায়ের ছাপ না অন্য কিছু!

রহমানও অবাক কণ্ঠে বলে উঠলো— সর্দার, এ কি!

এটা কি মানুষের পা না অন্য কিছুর পায়ের ছাপ?

সবাই তখন পায়ের ছাপ লক্ষ্য করছে। রক্তের মধ্যে এলোমেলো বিরাট চওড়া কয়েকটা পদচিহ্ন ফুটে আছে। কমপক্ষে দেড় ফুট লম্বা এবং চওড়া

এক ফুটোর অনেক বেশি হবে। কোনো মানুষের পায়ের ছাপ কখনও এতো বড় হতে পারে না।

প্রথমেই বনহুর আর রহমান হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো, কারণ জানালার শিকগুলো এমনভাবে বাঁকিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো যা কোনো মানুষের দেহের শক্তির কাজ নয়। জানালাটার শিক বাঁকিয়ে সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিলো কাপালিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর বুঝতে পারলো, কাপালিকটা শুধু দেখতেই অসুরের মত নয়, শক্তিও অসুরের মত আছে তার দেহে। অল্পক্ষণের মধ্যে মরিলা দ্বীপের পুলিশ অফিসে সংবাদ পৌঁছানো হলো। পুলিশ ইন্সপেক্টর কয়েকজন পুলিশসহ এসে হাজির হলো হোটেলে। অনেক পরীক্ষা করেও এই হত্যারহস্যের সমাধান খুঁজে পেলো না, তারা লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে চলে গেলো।

এই ঘটনার পর হোটেলে একটা ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। হোটেলের প্রাচীন ডিংগে কাপালিকের প্রবেশ কম কথা নয়!

মরিলা দ্বীপের পথে-ঘাটে-মাঠে এখানে-সেখানে প্রতিদিন এমনি হত্যারহস্য সদা লেগেই রয়েছে। তবে এতোদিন কোনো বাড়ি বা হোটেলে প্রবেশ করে কাপালিক কোনো লোককে হত্যা করেনি। এই হত্যাটা তাই ভীষণভাবে মরিলাবাসিগণকে চিন্তিত করে তুললো।

হাউবার্ড তো সেই যে জ্ঞান হারিয়েছে দু'দিন তার জ্ঞান ফেরার কোনো লক্ষণ নেই।

সেদিন বনহুর নিজের ক্যাবিনে বসে কাপালিক এবং তার হত্যারহস্য নিয়েই ভাবছিলো, এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো। কেউ কক্ষমধ্যে প্রবেশের পূর্বে এমনি বেল বাজানো এ হোটেলের নীতি।

বেলটা বেজে উঠতেই বনহুর সজাগ হয়ে বসলো— রহমান তো বাইরে গেছে, ফিরতে তার বিলম্ব আছে, তবে অসময়ে কে এলো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে!

বনহুর সোজা হয়ে বসতেই কক্ষে প্রবেশ করলো, এক মরিলা তরুণী। দেহে মহিলা দ্বীপবাসীর ড্রেস, দেহের বর্ণ খাঁটি গোলাপী। মাথায় ঝাঁকড়া রেশমী চুল। চোখ দুটিতে মায়াময় চাহনি। হাতে একটা ছোট ব্যাগ।

বনহুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো— আপনি এক্ষুণি চলুন, আমার বাবা আপনাকে ডাকছেন।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তরুণীর মুখে নিক্ষেপ করে অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর— কে আপনি? আর আপনার বাবাই বা কে? আমি তো আপনাকে চিনি না?

তরুণী অসহায় চোখে তাকিয়ে বললো— এই হোটেলের মালিক আমার বাবা...

বনহুর বলে উঠলো— হাউবার্ডের কন্যা তুমি?

হাঁ। এইমাত্র আমার বাবার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। তিনি বললেন, ৩নং ক্যাবিনের ভদ্রলোককে ডেকে আনো, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলবো।

বনহুর আর বিলম্ব না করে তরুণীটিকে অনুসরণ করলো।

তরুণী বনহুরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

হোটেলের ভিতর দিয়ে এ পথ-সেপথ করে পিছনে এসে দাঁড়ালো তরুণী। একটা সরু সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

তরুণী বললো—এই সিঁড়ি দিয়ে আপনাকে নিচে নামতে হবে।

বনহুর বললো— আমি রাজি আছি।

তরুণী এবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললো।

বনহুর আর তরুণী একসময় নিচে অন্ধকারময় একটা ক্যাবিনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

আঁতকে উঠলো যেন বনহুর, বললো— এই ঘরে তোমার বাবা থাকেন বুঝি?

মেয়েটি মাথা দুলিয়ে বললো—হাঁ। আসুন আমার সঙ্গে।

তরুণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো।

বনহুরও ভিতরে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কক্ষটা হোটেলের নিচের তলায় এক কোণে। জায়গাটা খুব অন্ধকার। সূর্যের আলো কোনোদিন বোধ হয় এখানে পৌঁছতে পারেনি। কক্ষমধ্যে পাশাপাশি দু'টো ছোট ছোট খাট। একটি খাটের উপর শুয়ে আছে হোটেলের মালিক হাউবার্ড।

তরুণী চিকন মিষ্টি স্বরে বললো— বাবা, ৩নং ক্যাবিনের ভদ্রলোক এসেছেন।

কন্যার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চোখ মেলে তাকালো হাউবার্ড এবং সঙ্গে সঙ্গে শয্যায় উঠে বসতে গেলো।

বনহুর হাউবার্ডের শয়নকক্ষ লক্ষ্য করে অত্যন্ত অবাক হয়ে পড়েছিলো, তবু সে তাড়াতাড়ি হাউবার্ডের শয্যায় বসে পড়ে তাকে পুনরায় শুইয়ে দিয়ে বললো— আমি আপনার পাশে বসছি, আপনি যা বলতে চান বলতে পারেন।

চারিদিকে ভীত নজরে তাকিয়ে বললো হাউবার্ড— আমার হোটেল থেকে সেই মস্তকহীন দেহটা... ...

হাঁ হাঁ, সেটা রাতারাতি সরিয়ে ফেলা হয়েছে মিঃ হাউবার্ড।

আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো.... ...

বনহুর বললো— আমাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে না। মৃতদেহ পুলিশ সরিয়ে নিয়েছিলো।

ভয়কম্পিত কণ্ঠে বললো হাউবার্ড— পুলিশ! আমার হোটেলে পুলিশ কেন? খুন হয়েছে আমার হোটেলে হয়েছে, এতে পুলিশের মাথাব্যথা কেন বলুন তো?

বনহুরের হাসি পাচ্ছিলো, লোকটা পাগল না ভালো মানুষ? বললো বনহুর— কোনো হত্যাকান্ড ঘটলে সেখানে পুলিশ আসবেই এবং তদন্ত করবেই।

কেন, এ হত্যা কি আমাদের ইচ্ছাকৃত হত্যা? পুলিশ বেটার কেমন ক্ষমতা গ্রেফতার করুক দেখি কাপালিক বেটাকে! যতসব নেংটি ইঁদুর এগুলো। ওদের মাথায় যদি একটু বুদ্ধি থাকতো তাহলে এতোদিন কাপালিক বেটা মরিলা দ্বীপ ছেড়ে কোথায় যে অন্তর্ধান হতো কে জানে!

বনহুর বললো— আপনি অসুস্থ, কাজেই বেশি কথা বলা আপনার পক্ষে উচিত নয়। আপনি ঘুমাতে চেষ্টা করুন।

হাউবার্ড চোখ বন্ধ করে ফেললো কিন্তু মুখে সে কথা বলতে লাগলো, বললো— আপনি না হলে আজ আমি বাঁচতাম না। আমি শুনেছি, আপনিই আমাকে আমার ক্যাবিনে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এতোক্ষণে তরুণী কথা বলে আবার— হাঁ, আপনি যে উপকার করেছেন সেজন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

হাউবার্ড লাফিয়ে উঠে বললো এবার— কি ভুলটাই না করেছি, এতোক্ষণ আমার মেয়ে এলিন-এর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেইনি! এসো মা এলিন, এঁর সঙ্গে হাত মিলাও।

এলিন এগিয়ে এলো, তারপর হাত বাড়িয়ে বনহুরের হাতে হাত মিলালো।

হাউবার্ড বললো— আপনার নামটা আমার হোটেলের খাতায় লেখা আছে কিন্তু মনে নেই—কি নাম যেন আপনার?

বনহুর বললো— মিঃ সোহেল।

হাঁ, ঠিক এবার আমার মনে পড়েছে। বড্ড ভুলে যাই আমি, মিঃ সোহেল। আর আপনার বন্ধুর নামটা কি যেন?

মিঃ রুহেল...

হাঁ হাঁ, এবার আর ভুলবো না— মিঃ সোহেল ও মিঃ রুহেল— ঠিক মনে থাকবে এখন। খুশিতে হাসে হাউবার্ড।

তরুণী গম্ভীর হয়ে বলে— বাবার কথায় আপনি মনে কিছু করবেন না, আমার বাবা বড্ড ছেলেমানুষের মত।

বনহুর বললো— আমি তো পূর্বেই বুঝতে পেরেছি।

বনহুর আর রহমান এখানে নিজেদের কান্দাইবাসী বলে পরিচয় দিয়েছে এবং নিজেদের নাম মিঃ সোহেল আর মিঃ রুহেল বলেছে।

❑

এরপর কয়েকদিন বেশ কেটে যায়। হোটেলে কোনো বিভ্রাট না ঘটলেও মরিলার পথে কয়েক দিনে প্রায় বিশটা মস্তকহীন মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে।

বনহুর আর রহমান এই কয়েকদিনে কিছুই করে উঠতে পারেনি। অনেক চেষ্টাতেও নরখাদক কাপালিকের সন্ধান পায়নি তারা।

কাপালিকের খবর পেয়ে ছুটে গেছে সেখানে বনহুর আর রহমান কিন্তু তারা পৌঁছবার পরেই কাপালিক উধাও হয়েছে। শুধু তার শিকার মস্তকহীন দেহটা পড়ে থাকতে দেখা গেছে পথের ধূলায়।

হোটেলের মালিক হাউবার্ড তার হোটেলে ভয়ানকভাবে সাবধানতা অবলম্বন করেছে। কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে, একটা বিড়াল পর্যন্ত যেন তার হোটেলে প্রবেশ করতে না পারে।

সেদিন বনহুর অবাক না হয়ে পারেনি—এতো বড় একটা হোটেলের মালিক অথচ সে কিনা থাকে কেমন একটা অন্ধকারময় ছোট ক্যাবিনে। ভেবে পায়নি বনহুর এমন নিভৃতে থাকার কারণ কি!

পরে বনহুর আরও জানতে পারলো, হাউবার্ড তার কন্যাকেও নিজের ঘরে রাখে না, তার শোবার কামরা ছেড়ে বেশ দূরে রয়েছে কন্যা এলিনের কামরা।

প্রায়ই এলিন মিঃ সোহেলবেশী বনহুরকে ধরে আনতো নিজের ক্যাবিনে, বলতো— আপনাকে বিরক্ত করবো, তাতে আপনি মনে কিছু নেবেন না তো?

বনহুর তার চালচলন এবং চাহনিতে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। অদ্ভুত মেয়ে এলিন— শুধু সুন্দরীই নয় সে, তার কথাবার্তা বড় সুন্দর আর সচ্ছ।

বনহুর এলিনকে দেখলেই ভাবতো, হাউবার্ডের মত লোকের এমন কন্যা হলো কি করে! হাউবার্ড শুধু কালোই নয়, আর চেহারাটাও কেমন যেন বে-খাপ্পা!

একদিন বনহুর এলিনকে জিজ্ঞাসা করে বললো— এলিন, তোমার বাবার কি তুমি আপন কন্যা?

খিলখিল করে হেসে বলেছিলো এলিন— হাঁ, একেবারে আপন। কেন, আপনার বুঝি সন্দেহ হয়?

বনহুর বলেছিলো— হয় বৈকি, কারণ হাউবার্ড আর তোমার চেহারার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

হাঁ, অনেকেই আপনার মত অবাক হয়। হাউবার্ড আমার বাবা নয়, এমনও বলেছে অনেকে।

বনহুর আর এলিনের মধ্যে দিন দিন কেমন যেন একটা ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠে। প্রায় সময়ই আজকাল এলিনের পাশে দেখা যায় বনহুরকে।

রহমান ভিতরে ভিতরে একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়।

কই, তার সর্দারকে ইতিপূর্বে কোনো মেয়ের সঙ্গে এমনভাবে গায়ে পড়ে মিশতে দেখেছে বলে মনে হয় না। এলিনের চেয়ে আরও অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার সর্দারের পরিচয় ঘটেছে। রহমান লক্ষ্য করেছে, এলিনের সঙ্গে মিশবার জন্য বনহুর যেন সদা উদগ্রীব।

এই অল্প কয়েক দিনেই উভয়ে যেন অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে।

রহমান সর্দারকে কিছুই বলতে পারে না, ভিতরে ভিতরে গুমরে মরে সে। রহমান চায় না তার সর্দার কোনো মেয়ের প্রেমে আকৃষ্ট হয়।

সেদিন হোটেলের ছাদে রহমান হঠাৎ এসে পড়ে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায়, দেখতে পায় এলিন আর বনহুর বসে আছে পাশাপাশি। এলিনের হাতখানা সর্দারের হাতের মুঠায়।

রহমান আর দাঁড়াতে পারলো না, ক্ষুব্ধভাবে চলে গেলো সেখান থেকে। নিজের কামরায় গিয়ে রহমান পায়চারী শুরু করলো, মনের মধ্যে তার ভয়ানক একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। সর্দার সামান্য একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলো? কোথায় কাপালিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে, না... ...

হঠাৎ বনহুরের কণ্ঠস্বর— রহমান... ...

রহমানের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, চমকে ফিরে তাকায়, কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—সর্দার।

রহমান, এলিন আমাকে আর তোমাকে তার ক্যাবিনে রাতে খেতে বলেছে। এলিন নিজের হাতে রান্না করে আমাদের খাওয়াবে।

রহমান গম্ভীরকণ্ঠে বলে— সর্দার, মাফ করবেন, আমার পেটটা আজ মোটেই ভাল নেই।

রহমানের গলার স্বরে বনহুর বুঝতে পারে, সে অভিমান করেছে। আসলে তার পেটে কোনো অসুখ হয়নি। মনে মনে হাসে বনহুর, বলে— তোমার জন্য নিরামিশ রান্না করতে বলবো।

সর্দার, আমাকে মাফ করবেন, আমি হোটেল ছাড়া কোথাও খাবো না।

বনহুর হেসে বললো— বেশ, তাহলে আমি একাই এলিনের আতিথ্য গ্রহণ করলাম।

রহমান কোনো কথা বললো না।

বনহুর বেরিয়ে যাচ্ছিলো, রহমান পিছু ডেকে বললো— সর্দার!

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো— বলো?

আমি ভাবছি এবার ফিরে গেলে হয় না?

গম্ভীর শান্তকণ্ঠে বললো বনহুর— আমাদের কাজ শেষ হয়েছে রহমান?

রহমান অবাক দৃষ্টি তুলে তাকালো, তারপর দৃষ্টি নত করে নিলো, কোনো জবাব সে দিলো না বা দিতে পারলো না।

বনহুর বললো— কাজ শেষ হলে আমরা মরিলা দ্বীপ ত্যাগ করবো। কথাটা বলে বেরিয়ে যায় বনহুর।

রহমান মনের ক্রুদ্ধভাব মনে চেপে চুপ করে থাকে।

❑

পাশাপাশি দুটো বিছানায় শুয়ে আছে বনহুর আর রহমান। সমস্ত হোটেল বাড়ি নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে হোটেলের ঘড়িটা প্রহর ঘোষণা করে চলেছে।

হোটেলের ভিতরে রন্ধনশালা থেকে চিমনির ধূঁয়োর ক্ষীণ রেখা আকাশে ভেসে যাচ্ছিলো। কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে হোটেলের বারান্দায়। হঠাৎ কেউ যেন আচমকা প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যই এই লণ্ঠনগুলো এভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো।

হোটেলের গেটে একটা মরিলা দ্বীপবাসী পাহারাদার। সে রীতিমত বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। তবে মাঝে কখনও কখনও ঘুমে জড়িয়ে আসছে তার চোখের পাতাগুলো।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

রহমান কিন্তু ঘুমায়নি, সে ঘুমের ভান করে সর্দারের কাজ লক্ষ্য করছিলো। বনহুর যখন শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো তখন রহমান সজাগ হয়ে চোখ মেললো।

বনহুর পরে নিলো তার ড্রেস। জমকালো দস্যু পোশাক। রিভলভারটা হাতের মুঠায় চেপে ধরে বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে।

রহমান তাকে অনুসরণ করলো, সর্দার ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে আসতেই সেও বেরিয়ে এলো আলগোছে।

বনহুর হোটেলের পিছন দিকে অগ্রসর হলো।

রহমান থামের আড়ালে আত্মগোপন করে তাকে লক্ষ্য রাখলো।

বনহুর সোজা পিছনের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো।

রহমান ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠছে ভীষণভাবে। বনহুর যে মিস এলিনের ক্যাবিনের দিকে চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রহমান রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

বনহুর যখন নিচে নেমে গেলো তখন রহমান উপর থেকে দেখতে লাগলো কোন্ দিকে যায় তার সর্দার। এলিনের ক্যাবিনে, না অন্য কোথাও।

যেখান হতে এলিনের দরজা স্পষ্ট দেখা যায় ঠিক সেইখানে এসে দাঁড়ালো রহমান। নীচ থেকে রহমানকে ঠিক দেখা যাবে না। রহমান স্তব্ধ নিঃশ্বাসে দেখছে তার সর্দার এসে দাঁড়ালো এলিনের দরজায়।

রহমানের বুকটা ধক্‌ধক্ করছে, কেন যেন সে সহ্য করতে পারছিলো না এই ব্যাপারটাকে। তবু সে নিশ্চুপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর এলিনের দরজায় মৃদু টোকা দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো, বেরিয়ে এলো এলিন।

রহমান স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছে, এলিনের দেহে নাইট ড্রেস। বনহুরকে দেখেই এলিন তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

বনহুর এলিনের হাতখানা বাম হস্তে তুলে নিয়ে কিঞ্চিৎ উবু হয়ে হাতের পিঠে চুম্বন করলো। বনহুরের দক্ষিণ হস্তের রিভলভারখানা মুহূর্তের জন্য চক্ চক্ করে উঠলো।

রহমান আর দাঁড়াতে পারলো না, সে দ্রুত ফিরে গেলো নিজের ক্যাবিনে। অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারী করতে লাগলো, সে নিজের চোখকে কি করে অবিশ্বাস করবে। সর্দার তো পূর্বে এমন ছিলো না।

রহমান শয্যা গ্রহণ করে কিন্তু ঘুমাতে পারে না। সব সময় দৃষ্টি তার ঘড়ির কাঁটার দিকে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চলে এখনও ফিরে এলো না বনহুর। রহমানের মুখ রাঙা হয়ে উঠে, তবে কি সর্দার এতোক্ষণ এলিনের ক্যাবিনে রয়েছে? না না, এতো জঘন্য হতে পারে না তার সর্দার...

রহমানের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, বনহুর প্রবেশ করে ক্যাবিনে।

রহমান ঘুমের ভান করে চুপচাপ পড়ে থাকে।

বনহুর ড্রেস পরিবর্তন করে শয্যা গ্রহণ করে। রিভলভারখানা শোবার পূর্বে বালিশের নিচে রেখে চোখ বন্ধ করলো।

বনহুর অল্পক্ষণে ঘুমিয়ে পড়লো।

রহমানের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। সে ভেবে চলেছে হঠাৎ সর্দারের মধ্যে এমন পরিবর্তন এলো কি করে। দেবচরিত্র তার সর্দার এমনভাবে একটা

মেয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে পড়বে, এটা যেন তার কল্পনার বাইরে। মরিলা দ্বীপে এসেছে তারা শয়তান নরখাদক কাপালিককে শায়েস্তা করতে কিন্তু একি ঘটে চলেছে...নানারকম চিন্তা করতে করতে একসময় রাত ভোর হয়ে আসে।

ভোরেই শোনা যায়, আজ মরিলা দ্বীপে একসঙ্গে পাঁচটি মস্তকহীন মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। কয়েকটা মৃতদেহের মধ্যে দুটো মরিলা দ্বীপের অধিবাসী আর তিনটা মরিলা দ্বীপের বাইরের লোক, তাদের দেহের পোশাক দেখে অনুমান করা হয়েছে।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে রহমান গম্ভীর মুখে ক্যাবিনে প্রবেশ করলো, হাতে একখানা কাগজ।

বনহুর বললো— ওটা কি রহমান?

রহমান কাগজখানা এগিয়ে দিলো— দেখুন সর্দার।

কাগজখানা কোনো পত্রিকা নয়— একটা রিপোর্ট। বনহুর রিপোর্টখানায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো— আজ রাতে পাঁচটা মস্তকহীন মৃতদেহ পাওয়া গেছে----সর্বনাশ!

শুধু সর্বনাশই নয় সর্দার, আর কয়েক দিনে মরিলা দ্বীপ মানবশূন্য হয়ে পড়বে।

হুঁ, তাই মনে হচ্ছে। নরখাদক কাপালিক দেখছি পাল্লা দিয়ে নরহত্যা শুরু করেছে।

সর্দার, আমরা আজও কাপালিকটার কোনো কিছুই করতে পারলাম না। কথা কয়টা বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললো রহমান।

বনহুর ভ্রু কুঞ্চিত করে কি যেন ভাবলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো— রহমান, প্রস্তুত হয়ে নাও, নাস্তা সেরে নিয়ে আমরা বের হবো। কোথায় এসব লাশগুলো পাওয়া গেছে জানতে চাই।

সর্দার, একটা কথা বলতে চাই আমি?

থাক্, আজ নয়, আরও পরে বলো। যাও, তুমি তৈরি হয়ে নাও।

বনহুর বাথরুমে প্রবেশ করলো।

রহমান বেরিয়ে গেলো তৈরি হবার জন্য।

মরিলা পুলিশ অফিসে পৌঁছে অবাক না হয়ে পারলো না বনহুর। একসঙ্গে এতোগুলো বীভৎস লাশ দেখে পুলিশমহল ভয়ে-ত্রাসে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সবাই।

বনহুর আর রহমান মরিলা পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ লোরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আলাপ করে নিলো। প্রথমে ওরা বনহুর আর রহমানকে দেখে আশ্চর্য এবং সন্দিহান হয়ে পড়েছিলো, কারণ বনহুর আর রহমানকে মরিলা দ্বীপবাসী বলে মনে হয় না। তাছাড়াও এদের ড্রেস ভিন্ন ধরনের ছিলো। কাজেই সন্দেহ হবার কথাই বটে।

বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হবার পর মরিলা পুলিশ ইন্সেপেক্টর মিঃ লোরী বনহুরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা জানালেন। খুব খুশি হলেন তারা বনহুর আর রহমানের মনোভাব জানতে পেরে।

বনহুর আর রহমানকে আশ্বাস দিলেন মিঃ লোরী— কাপালিক হত্যা ব্যাপারে তাঁরা পুলিশমহল তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

বনহুর পুলিশমহলে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারলো তারা কাপালিক ব্যাপারে অত্যন্ত ঘাবড়ে গেছেন। বিশেষ করে এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁরা কি করবেন, কিভাবে কাপালিকের পিছু ধরবেন, কোনোই সমাধান খুঁজে পাননি। তবে দেশবাসিগণকে রক্ষার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি তাঁরা।

সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যার পর কেউ যেন বাড়ির বাইরে না যায়। কড়া পাহারার ব্যবস্থাও করা হয়েছিলো কিন্তু পাহারারত পুলিশগুলোও যখন নিহত হতে শুরু করলো, তখন পুলিশগণ ভয়ানকভাবে ভীত হয়ে পড়লো—চাকরি ত্যাগ করতে তারা রাজি আছে কিন্তু সন্ধ্যার পর বাইরে থাকতে কেউ রাজি নয়।

মরিলা দ্বীপে কয়েকজন পুলিশও কাপালিক হস্তে জীবন দিয়েছে।

রাতে তাদের পাহারায় নিযুক্ত রাখা হয়েছিলো পরদিন দেখা গেছে, যে স্থানে তারা পাহারা ছিলো সেই স্থানে পড়ে আছে তাদের মস্তকহীন দেহ, রক্তে ছুপছে আছে পথের বুক!

এরপর কোনো পুলিশ পাহারা দিতে রাজি হয়নি।

পুলিশ ভ্যান সন্ধ্যার পূর্বে রাজপথে বেরিয়ে জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে আসতো। মাঝে মাঝে সংকেতধ্বনি করে দ্বীপবাসীগণকে সজাগ করে দেওয়া হতো।

বনহুর পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করার পর মস্তকহীন দেহগুলো স্বচক্ষে দেখলো। কি ভয়ঙ্কর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড!

পুলিশ অফিস থেকে বেরিয়ে বনহুর আর রহমান লাশগুলো কোথায় পাওয়া গেছে সেইসব জায়গা দেখলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার তাঁর গাড়িতে করেই নিয়ে গিয়ে সেইসব জায়গা দেখালেন।

সমস্ত দিন ধরে এইসব তদন্ত করে সন্ধ্যার পূর্বে হোটেলে ফিরে এলো বনহুর আর রহমান। এসেই দেখলো তাদের আগমন প্রতীক্ষায় হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হাউবার্ড সশরীরে।

বনহুর আর রহমানকে দেখে খুশি হয়ে বললো—যাক, সকাল সকাল ফিরে এসেছো তাহলে। এমনি না হলে হয়!

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই এলিন এসে হাজির হলো, হেসে বললো—সারাটা দিন কোথায় ছিলেন আপনি? হাত দু'খানা দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গেলো বনহুরের গলা।

বনহুর সরে দাঁড়ালো সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করার ভান করে।

রহমান এলিনের ভাবসাব লক্ষ্য করে মুখ গম্ভীর করে ফেললো, বেরিয়ে গেলো সে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে।

বাইরে গিয়েও রহমানের মধ্যে স্বস্তি এলো না, রাগে গসগস করতে লাগলো সে। কক্ষমধ্য হতে শোনা যাচ্ছে এলিনের হাসির শব্দ।

রহমান কান পেতে রইলো সর্দারের কণ্ঠ শোনা যায় কিনা—হাঁ, সত্যি বনহুরও হাসছে এলিনের সঙ্গে।

রহমান সরে গেলো সেখান থেকে।

❑

ঐদিন রাতে আবার হোটেলে এক মর্মস্পর্শী আর্তনাদ জেগে উঠলো। ঘুম ভেঙ্গে গেলো বনহুরের, সঙ্গে সঙ্গে রহমানেরও।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো ওরা। সেকি তীব্র আর তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার। বনহুর রিভলভার হাতে নিয়ে ছুটলো হোটেলের পিছন ক্যাবিনের দিকে।

রহমানও অনুসরণ করলো আর একটা রিভলভার নিয়ে সর্দারকে।

হোটেলটা সম্পূর্ণ অন্ধকার, বারান্দা ধরে দ্রুত ছুটছিলো ওরা। হঠাৎ বনহুরের দেহে ধাক্কা লাগলো কোনো একটা দেহের সঙ্গে।

বনহুর পড়ে যেতে যেতে টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, অন্ধকার হলেও বনহুর আর রহমান স্পষ্ট দেখলো, জমকালো একটা বিশালদেহী লোক তাদের পাশ কেটে সা করে চলে গেলো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রিভলভার উদ্যত করলো, নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করে শব্দ হলো, গুড়ুম...

কিন্তু কোনো আর্তনাদই ভেসে এলো না বিপরীত দিক থেকে।

ততক্ষণে এদিক-ওদিক থেকে হোটেলের লোকজন ছুটে এসেছে,— কারো হাতে লণ্ঠন, কারো হাতে টর্চ লাইট।

বনহুর আর রহমান দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মুখোভাবে দারুণ উদ্বিগ্নতার ছাপ বিদ্যমান।

রহমান বললো লোকজনদের উদ্দেশ্য করে— এই দিকে পালিয়েছে...

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠলো— কে পালিয়েছে?

রহমান বললো—জমকালো একটা লোক। নিশ্চয়ই শয়তান কাপালিক হবে।

যে পথে অন্ধকারে কালো লোকটা পালিয়েছিলো, বনহুর এবং অন্যান্য সকলে দেখলো—সেদিনের মত বেলকুনির উপর ছড়িয়ে আছে তাজা লাল টকটকে রক্ত।

ওদিকে হোটেলের এক ক্যাবিনে প্রবেশ করে একজন লোক, আর্তনাদ করে উঠলো— খুন, খুন, আজ আবার খুন হয়েছে!

ছুটলো সবাই সেই দিক লক্ষ্য করে।

একটা ক্যাবিনে প্রবেশ করে সকলের চক্ষু স্থির হলো— দেখলো একটা মস্তকহীন মৃতদেহ পড়ে আছে পাশের শয্যার উপর।

খবর পেয়ে হা হা করে ছুটে এলো হোটেলের মালিক হাউবার্ড ও তার কন্যা এলিন।

কিন্তু হাউবার্ডকে ক্যাবিনের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না। হঠাৎ আজ আবার তিনি যদি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন তখন বিভ্রাট ঘটতে পারে।

হাউবার্ডকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, তিনি খুনের কথা শুনেই একেবারে জ্ঞান হারাবার জোগাড় হয়েছেন। অনেকে নানাভাবে সান্ত্বনা জোগাতে লাগলো।

বনহুর হতাশ হয়ে ফিরে এলো নিজের ক্যাবিনে। তার সমস্ত মুখমন্ডলে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে— আশ্চর্য, এতো সতর্কতার মধ্যেও ঠিক নিয়মমত খুন করে চলছে নরখাদক কাপালিক। কেউ তাকে শায়েস্তা করতে সক্ষম হচ্ছে না। বনহুর নিজেও হতাশ হয়ে পড়েছে।

রহমানও অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়েছে সর্দারকে এখানে নিয়ে আসার পিছনে রয়েছে সে। হঠাৎ যদি সর্দারের কিছু একটা হয়ে পড়ে তখন সম্পূর্ণ দোষী হবে সে।

❑

পরদিন আবার খুন হলো।

একটি নয়, দু'টি— তাও হোটেলের ক্যাবিনে।

বনহুর শুধু অবাকই হলো না, হতভম্ব হলো। কাপালিকের আক্রোশ এবার হোটেলে এসে সীমাবদ্ধ হলো। বাইরেও খুন, হোটেলেও খুন, দ্বীপের অন্যান্য স্থানেও খুন। একটা লোক এতো খুন করছে, অথচ তাকে কেউ আজ পর্যন্ত গ্রেফতার করতে সক্ষম হচ্ছে না বা তাকে হত্যা করতে পারছে না।

এই অদ্ভুত কাপালিকটা কোথা হতে আসে, আবার কোন্ পথে কোথায় চলে যায়, কে জানে! দিনের পর দিন শুধু হত্যাই করে চলেছে, যেন বিরাম নেই সে হত্যার।

বনহুর অনেক চিন্তা করেও এই কাপালিকটার কোনোই হদিস্ করতে পারলো না।

মরিলা দ্বীপে বনহুরের আগমনের পর প্রায় সপ্তাহ কয়েক কেটে গেলো। বনহুর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে, শুধু মরিলা দ্বীপেই নয়, আশেপাশে অনেক স্থানে এমনি মস্তকহীন নরদেহের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

আজকাল বনহুর প্রায়ই এলিনের কামরায় বেশি সময় কাটায়। হয়তো কাপালিকের হদিস না করতে না পেরে মনের অস্থিরতার জন্যই সে এলিনের সান্নিধ্য লাভে আনন্দ বোধ করে।

এলিন বনহুরকে পেলে সব ভুলে যায়, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে সে।

রহমানের মনটা আজকাল বড় ভাল যাচ্ছে না, সে বনহুর আর এলিনকে নিয়ে বেশ ভাবিত হয়ে পড়েছে। সর্দারকে এ ব্যাপার নিয়ে কিছু বলাটাও সে সমীচীন মনে করে না।

হঠাৎ একদিন বনহুর রহমানকে বলে বসলো— রহমান, আজ রাতে হোটেলে খুন হবে........

রহমান দু'চোখ কপালে তুলে বললো— একি বললেন, সর্দার?

হাঁ, সত্যি কথা বলছি। আজ রাতে কাপালিক হোটেলে হানা দেবে।

সর্দার!

রহমান, তুমি এ কথা কাউকে বলবে না।

ঢোক গিলে বললো রহমান— সর্দার, আপনি.......

আমি জানতে পেরেছি, কাপালিক আজ এই হোটেলে হানা দেবে। শোন রহমান, আজ তুমি ভিন্ন ক্যাবিনে শোবে। আমি একা থাকতে চাই আমাদের ক্যাবিনে। বিশেষ করে সে আমাদের ক্যাবিনেই আগমন করবে।

রহমানের মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো, কোনো কথা তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ হলো না। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলো সে সর্দারের মুখের দিকে।

বনহুর বললো— রহমান, আজ তুমি ভিন্ন ক্যাবিনে শয়ন করবে, কথাটা যেন ভুলে যেও না।

সর্দার।

হাঁ, কারণ আমাদের ক্যাবিনে আমি একা থাকতে চাই।

তা হয় না সর্দার।

আমি যা বলছি সেইভাবে কাজ করবে। কারণ কাপালিক জানতে পেরেছে, আমরা তার পিছু লেগেছি। তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছি।

সর্দার, আমি আপনাকে একা এ ক্যাবিনে থাকতে দিতে পারি না সর্দার। মরতে হয় দু'জনই মরবো........

হেসে উঠলো বনহুর— মরতে চাও? পাগল আর কি। মরা তোমার চলবে না, বুঝলে?

বাঁচতে আমি চাই না সর্দার। হঠাৎ আপনার যদি কিছু একটা হয়ে যায়।

হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো......যাও রহমান, সন্ধ্যার পূর্বেই তুমি অন্য ক্যাবিনে তোমার শয়নের ব্যবস্থা করে নাও।

রহমান বাধ্য হয়ে ছাত্রের মত মাথা নিচু করে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো।

❑

রাত বেড়ে আসছে।

রহমান তার ক্যাবিনে রিভলভার হস্তে পায়চারী করে চলেছে। সর্বদা কান দু'টোকে সজাগ রেখেছে সে, উৎকণ্ঠা আর উদ্বিগ্নতায় চঞ্চল তার মন। না জানি তার সর্দার আজ কাপালিক হস্ত হতে পরিত্রাণ পাবে কিনা, কে জানে।

বনহুর তখন বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়ে আপন মনে সিগারেট পান করে চলেছে। মাঝে মাঝে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো সে। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ তার মুখমন্ডল অনেকটা প্রসন্ন সচ্ছ মনে হচ্ছে।

হোটেলের ঘড়ি রাত দুটো ঘোষণা করলো।

বনহুর বিছানা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো, পরে নিলো তার নিজস্ব দস্যু ড্রেস।

রহমান তার ক্যাবিনে থাকলেও জানালার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলো সে সর্দারের ক্যাবিনের দিকে। কাপালিক কখন কোন মুহূর্তে আগমন করে দেখবে এবং যদি দরকার হয় সর্দারের জীবন রক্ষার্থে কাপালিকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, প্রাণ দিতে হয় তাও দেবে রহমান।

হোটেলের বারান্দায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। রহমান জানালার ফাঁকে উঁকি দিয়ে বারবার দেখে নিচ্ছিলো সর্দারের ক্যাবিনের দরজাটা।

বারান্দায় লটকানো লণ্ঠনের আলোতে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো বনহুরের ক্যাবিনের দরজা এবং ওদিকের আরও খানিকটা অংশ।

রহমান হঠাৎ চমকে উঠলো, সে লক্ষ্য করলো— সর্দারের ক্যাবিনের দরজা খুলে গেলো। শিউরে উঠলো রহমান, মুহূর্তের জন্য মুখ তার কালো হয়ে উঠলো, তবে কি ভিতরে কাপালিক প্রবেশ করেছিলো? সর্দারকে হত্যা

করে বেরিয়ে আসছে! রহমান তার রিভলভার জানালার ফাঁক দিয়ে উঁচু করে ধরলো, কাপালিক বের হবার সঙ্গে সঙ্গে গুলী ছুঁড়বে সে। রুদ্ধ নিশ্বাসে লক্ষ্য করছে রহমান, বুক তার ঢিপ্ ঢিপ্ করছে ভীষণভাবে, না জানি কি সে লক্ষ্য করবে এই মুহূর্তে!

বনহুরের ক্যাবিনের দরজা খুলে গেলো, তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো বনহুর স্বয়ং।

রহমান বিস্ময়ে স্তব্ধ হলো, ধীরে ধীরে রিভলভারখানা সরিয়ে নিলো সে জানালার ফাঁক থেকে। কিন্তু দৃষ্টি সে সরিয়ে নিতে পারলো না, দেখতে লাগলো কি করে সর্দার।

বনহুর ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে তাকালো চারিদিকে।

বনহুরের দেহে জমকালো ড্রেস, দক্ষিণ হস্তে চক্‌চক্ করে উঠলো তার জমকালো রিভলভারখানা। সোজা সে সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছে।

রহমান স্থির নয়নে তাকিয়ে আছে, সর্দার এভাবে কোথায় চলেছে? সে নিজকে ধরে রাখতে পারলো না, জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো দরজা খুলে অতি সন্তর্পণে।

বনহুরকে অনুসরণ করলো রহমান।

..একি! সর্দার পিছন সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তবে কি সর্দার এলিনের কক্ষে যাবে? না না, তা হয় না, এতো জঘন্য নীচ হতে পারে না তার সর্দার। রহমান একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে অধর দংশন করে।

তার চিন্তা মিথ্যা নয়, বনহুর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে। রহমান দু'চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে আছে।

বনহুর সোজা এলিনের দরজায় এসে মৃদু টোকা দিলো।

দরজা খুলে গেলো, এলিন বেরিয়ে এলো একরকম প্রায় হাত ধরে টেনে নিলো ভিতরে।

বনহুর কোনো আপত্তি না করে এলিনের কামরায় প্রবেশ করলো।

রহমানের দেহের রক্ত মুহূর্তে গরম হয়ে উঠলো, ইচ্ছা হলো এই দন্ডে গিয়ে সর্দারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে, সর্দার, একি করছেন আপনি...পায়ের নিচে মাটি যেন দুলছে রহমানের, সে আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলো না, ফিরে গেলো নিজের ক্যাবিনে।

শয্যায় শয়ন করতে পারলো না রহমান, বসে দু'হাতে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলো। সে কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

তার সর্দারের মত ব্যক্তি সামান্য একটি মেয়ের প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তার সঙ্গে ছলনা করলো। রাতে এলিনের সঙ্গে কাটাবে বলে তাকে ভিন্ন ক্যাবিনে পাঠানো হলো। কিন্তু সর্দার তো কোনোদিন এমন ছিলো না।

এক সময় ভোর হয়ে আসে।

রহমান আজ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে পড়েছে। সে নিজে কিছুতেই সর্দারের ক্যাবিনে যাবে না। যে ক্যাবিনে রাতে ছিলো সেই ক্যাবিনেই বসে রইলো চুপচাপ।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চলেছে।

রহমান ক্ষুদ্ধ হলেও প্রতীক্ষা করতে লাগলো কখন আসবে সর্দার তার সন্ধানে।

এক সময় রহমান পদশব্দে চোখ তুলে তাকালো।

বনহুর তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

রহমান উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির আভাস লেগে রয়েছে।

রহমান বনহুরের মুখে নত দৃষ্টি তুলে ধরে, মনে মনে আরও ক্ষুদ্ধ হলো, কিন্তু মুখে কিছু না বলে চুপ রইলো।

বনহুর বললো— রহমান, তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে রাতে তুমি মোটেই ঘুমাওনি?

রহমান কোনো জবাব না দিয়ে থাকতে পারলো না, সে বললো— সর্দার, কাপালিকের আগমন আশঙ্কায় আমার চোখে ঘুম আসেনি।

হাঁ, তোমার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি।

সর্দার, কাপালিক কাল রাতে হোটেলে হানা দেবার কথা ছিলো, কিন্তু সে..

দেয়নি, এই তো?

হাঁ।

শুধু হোটেলেই নয় রহমান, কাল সে কোথাও হানা দেয়নি, সমস্ত দ্বীপে বা দ্বীপের বাইরে কোথাও হত্যাকান্ড হয়নি।

আশ্চর্য হয়ে তাকালো রহমান সর্দারের মুখের দিকে। কি করে সর্দার এই সকাল বেলাই জানতে পারলো আজ কোথাও হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়নি? এখনো তো বাইরের কোনো খবর এসে পৌঁছায়নি হোটেলে।

বনহুর রহমানের মনোভাব বুঝতে পেরে বললো— আমি কাপালিককে আজ আটকে রেখেছিলাম রহমান।

সম্মুখে ভূত দেখলে যেমন মানুষ চমকে উঠে তেমনি ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠলো রহমান। দু'চোখ ছানাবড়া করে তাকালো সে সর্দারের মুখের দিকে।

বনহুর বললো— এসো আমার সঙ্গে।

কোথায় যাবেন সর্দার?

হাউবার্ডের ক্যাবিনে। বেচারী তো কাল কাপালিকের ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বড় ভীতু হাউবার্ড।

রহমান আর বনহুর এগুলো সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে। হোটেলের নিচে এক কোণে হাউবার্ডের শয়নকক্ষ। এতোবড় হোটেল অথচ মালিক একেবারে নিচে এবং নির্জন স্থানে থাকে—কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে সবার কাছে।

বনহুর সম্মুখে, পিছনে রহমান সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে।

এক সময় বললো রহমান— সর্দার, কাপালিকটাকে আপনি কি করে আটকে রাখলেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আজ নয়, পরে সব বলবো রহমান। হাঁ, এইটুকু শুনে রাখো, আমি কাপালিকের সন্ধান পেয়েছি।

সত্যি সর্দার!

তা না হলে তাকে কি করে কাল নরহত্যা থেকে ক্ষান্ত রাখতে সক্ষম হলাম, বলো?

রহমান ভুলে গেলো সকল মান-অভিমান। সে নীরবে সর্দারকে অনুসরণ করলো।

হাউবার্ডের ক্যাবিনে এসে রহমান অবাক হলো— বেচারী হাউবার্ড শয্যায় শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। চোখমুখ তার চুপষে বসে গেছে যেন। বনহুর আর রহমানকে দেখে খুশি হলো হাউবার্ড, শয্যা ত্যাগ করে বললো—বসুন, বসুন আপনারা।

বনহুর আর রহমান আসন গ্রহণ করলো।

হাউবার্ড বসলো তাদের পাশে, নিজের বুকে হাত বুলিয়ে বললো— ভাগ্যিস, আপনারা ছিলেন তাই আমার কতকটা সাহস। কাপালিক বেটার ভয়ে আমার বুকটা জ্বালা করছে!

বনহুর বললো— কাপালিক বেটার ভয়ে বুক জ্বালা করছে না টিপ্‌টিপ্ করছে মিঃ হাউবার্ড?

জ্বালা, বড্ড জ্বালা করছে। কেমন যেন অস্তস্তি বোধ করছি মিঃ সোহেল।

বনহুর বললো এবার— অস্বস্তির কোনো কারণ নেই। আজ কাপালিক আসবে না কারণ সে নরহত্যার নেশায় দ্বীপের বাইরে কোথাও গমন করবে।

হাউবার্ডের মুখ খুশিতে দীপ্তময় হলো, জড়িয়ে ধরলো বনহুরকে— সত্যি বলছেন, আমার হোটেলে সে তো আর হানা দেবে না?

সে কথা আমি সঠিক বলতে পারছি না যদিও,তবু আমার মনে হয়, সে আজ বাইরে কোথাও দূরে গমন করে তৃপ্তির সঙ্গে রক্ত পানের নেশায় মেতে উঠবে.......

হাঁ, সত্যি রক্তপানে কাপালিক বেটা অফুরন্ত তৃপ্তি পায়। সেকি পরম তৃপ্তি......বুকে হাত বুলায় হাউবার্ড।

বনহুর হেসে বলে— আপনি আমার বন্ধু মিঃ রুহেলের সঙ্গে গল্প করুন, আমি এক্ষুণি আসছি। মিস্ এলিন আছে না তার ক্যাবিনে?

হাঁ আছে। মেয়েটা আমার বড় ভড়কে গেছে এই কাপালিক বেটার ভয়ে।

তা তো যাবারই কথা। আপনি পুরুষ মানুষ হয়ে কাপালিকের ভয়ে কুঁকড়ে গেছেন আর সে তো মেয়েমানুষ.......আচ্ছা, আপনারা, আলাপ করুন আমি আসছি। তারপর রহমানকে লক্ষ্য করে বলে—একসঙ্গে যাবো। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি ততক্ষণ অপেক্ষা করো।

বনহুর রহমানের জবাবের প্রতীক্ষা না করে বেরিয়ে যায়।

রহমান উসখুস করতে থাকে। মিঃ হাউবার্ডকে তার মোটেই ভালো লাগে না, কেমন যেন হাবা হন্তখন্ত মানুষটা এই মিঃ হাউবার্ড। তবু কি করবে, কথা না বলে তো কোনো উপায় নেই। রহমান বললো এবার— মিঃ হাউবার্ড?

আমাকে বলছেন মিঃ রুহেল?

হাঁ, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো?

করুন। আঃ, কি জ্বালা.......উঃ কি জ্বালা.......

রহমান থতমত খেয়ে বললো—জ্বালা? কিসের জ্বালা?

এই বুকে........

আপনার বুকে জ্বালা আছে?

হাঁ, অত্যন্ত জ্বালা......হাউবার্ড তার বিশাল বুকে হাত বুলোতে লাগলো।

রহমান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলো তার বিরাট বপুখানার দিকে।

হাউবার্ডের অস্থিরতা দেখে মায়া হলো রহমানের। বেচারী কোনো দারুণ একটা কষ্টে ভুগছে বলেই মনে হলো তার। বললো রহমান— আপনাকে বড় অসুস্থ মনে হচ্ছে........

না না, আমি অসুস্থ নই মিঃ রুহেল, অসুস্থ আমি নই। বলুন আপনি কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন, বলুন?

আপনার মেয়ে এলিন সম্বন্ধে একটা কথা আপনাকে বললো......

আমার মেয়ে এলিন সম্বন্ধে আপনার মনে বুঝি সন্দেহ হচ্ছে?

হঠাৎ মিঃ হাউবার্ডকে এই প্রশ্ন করতে দেখে হকচকিয়ে গেলো রহমান। লোকটা জ্যোতিষী নাকি? তার মনের কথা বলে বসলো কি করে? তাড়াতাড়ি বললো রহমান— না না, সন্দেহ আমি মোটেই করি না.....

আবার রহমানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো মিঃ হাউবার্ড— আপনি মুখে একথা অস্বীকার করলে কি হবে, ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই আপনি খুব অবাক হয়েছেন। তা হবারই কথা— অনেকেই এমনিভাবে সন্দেহ করে, আর আপনি করবেন না কেন?

রহমান কিছু বলতে পারলো না বা বলবার মত সুযোগই পেলো না। হাউবার্ড বলে চললো আমার সঙ্গে মেয়ের চেহারা আকাশ-পাতাল তফাৎ— এটা শুধু আপনি কেন, অনেকেই সন্দেহ করেন।

এতোক্ষণে রহমান যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, বললো— হাঁ হাঁ, আমিও ঐ রকম সন্দেহ করছিলাম। সত্যি, এলিন আপনার মেয়ে...

বলে মনে হয় না, এই তো?

ঢোক গিলে বললো রহমান— হাঁ, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম...

আমার নিজের মেয়ে কিনা?

মাথা দুলিয়ে বললো রহমান— হাঁ।

শুনুন আমি বলছি। সোজা হয়ে বসলো হাউবার্ড।

রহমান একটু নড়েচড়ে বসলো ভালো হয়ে।

হাউবার্ড আবার বুকে হাত বুলোতে লাগলো। মনে হলো বুকের ভিতরে তার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। একটু কেশে বললো— এলিন সত্যি আমার মেয়ে

নয়। ওকে আমি বিদেশ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। বড় সুন্দর কন্যা, তাই ওকে তাড়িয়ে না দিয়ে মেয়ে বলে গ্রহণ করেছি। আপনার কেমন লাগে ওকে?

আমার? রহমানের মুখ যেন রাগে লাল হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললো— খুব ভালো লাগে।

আপনার বন্ধু মিঃ সোহেল ওকে বড় ভালোবাসেন।

হুঁ, বাসেন।

আপনার সঙ্গে বুঝি বেশি ভাব জমে উঠেনি ওর?

আমার বন্ধুর সঙ্গে ভাব জমেছে সেটাই ভালো। আচ্ছা চলি আমি, কেমন? উঠে দাঁড়ায় রহমান।

হাউবার্ড বলে— আসুন তাহলে।

আসবো না— যাচ্ছি। আমার বন্ধু এলে বলবেন আমি হোটেলে চলে গেছি।

বলবো, বলবো......আপনার বন্ধু বুঝি এখনও এলিনের ক্যাবিনে...

হাঁ, চলি। রহমান বেরিয়ে যায়।

এলিনের ক্যাবিনের পাশ দিয়েই হোটেলে ফিরে যাবার সিঁড়ির মুখ। রহমান এলিনের ক্যাবিনের সম্মুখে আসতেই তার কানে গেলো ক্যাবিনের ভিতরে এলিনের হাসির সঙ্গে তার সর্দারের হাসিভরা গলার আওয়াজ।

রহমান মুহূর্ত বিলম্ব না করে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেলো উপরে।

❑

বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো বনহুর।

রহমান তখন রাগে-ক্ষোভে ফোঁস ফোঁস করছে। বনহুর এসে কাপড় পাল্টে শুয়ে পড়লো বিছানায়। একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে ধূম্ররাশি ত্যাগ করে চললো।

রহমানও বিছানায় বসে বসে আপন মনে কিছু চিন্তা করছিলো আর লক্ষ্য করছিলো সর্দারকে।

হঠাৎ বলে বসলো বনহুর— রহমান, আগের চেয়ে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছি, কারণ কাপালিকের সন্ধান আমি পেয়েছি।

রহমান বলে উঠলো— তাহলে তাকে এই মুহূর্তে হত্যা করছেন না কেন সর্দার?

সে কথাও আজ খুলে বলবো না রহমান, কারণ এতে আমাদের কোনো অমঙ্গল ঘটতে পারে।

তাহলে বলবেন না সর্দার। রহমান একটু অভিমানভরে বললো কথাটা। অবশ্য অভিমান হবার কথাই বটে। সর্দারের পার্শ্বসহচর রহমান। এমন কিছু কথা নেই যা সর্দার তার কাছে গোপন রাখে। আজ কি হয়েছে সর্দারের তাই তাকে বলেই নিশ্চিন্ত হচ্ছে সে।

বনহুর রহমানের অভিমানভরা কণ্ঠে হাসলো মাত্র, তারপর বললো— রহমান, আজ রাতে আমরা দূরে এক স্থানে যাবো, কাজেই রাতে বিশ্রাম হবে না, তুমি এই সময় বিশ্রাম করে নাও।

কথাটা বলে বনহুর পাশ ফিরে শয়ন করলো।

অনেক পরে ঘুম ভাংলো বনহুরের। জেগে দেখলো রহমান বিছানায় নেই। কলিং বেলে চাপ দিতেই বয় ছুটে এলো—স্যার, কি চাই?

আমার বন্ধু মিঃ রুহেল কোথায়?

বয় বললো—তঁকে মিস এলিনের ক্যাবিনের দিকে যেতে দেখেছি।

ভ্রু কুঁচকে বললো বনহুর— মিস এলিনের ক্যাবিনের দিকে যেতে দেখেছো তাকে?

হাঁ স্যার।

আচ্ছা যাও।

চলে গেলো বয়।

বনহুর দ্রুত গায়ে জামাটা পরে নিয়ে নিচে নেমে গেলো সিঁড়ি বেয়ে। এলিনের ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়াতেই বনহুর শুনতে পেলো রহমানের গলার স্বর— মিস্ এলিন, আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আমার বন্ধুর সর্বনাশ করবেন না। তাকে আপনি জড়াতে চেষ্টা করবেন না.......

বনহুরের মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে কঠিন কণ্ঠে বললো— রহমান, তুমি এখানে কেন?

চমকে উঠলো রহমান, মাথা নত করে দাঁড়ালো সে অপরাধীর মত, কোনো জবাব দিতে পারলো না বা চোখ তুলে তাকাতে পারলো না রহমান সর্দারের মুখের দিকে।

বনহুর বললো— রহমান, চলো আমার সঙ্গে।

বনহুর একবার এলিনের দিকে তাকিয়ে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেলো।

রহমান তাকে অনুসরণ করলো।

বনহুর নিজের কক্ষে প্রবেশ করে পায়চারী করতে লাগলো।

রহমান এসে দাঁড়ালো একপাশে, মুখখানা তার লজ্জাবনত হয়ে আছে।

বনহুর পায়চারী বন্ধ করে বললো— রহমান, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো?

রহমান চোখ তুলে তাকালো কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

বনহুর আবার বললো— বলো, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো কিনা? সঠিক জবাব দাও রহমান?

রহমান যেন বোবা বনে গেছে।

বনহুর এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, বললো— তুমি আমাকে অবিশ্বাস করবে কোনোদিন ভাবতে পারিনি রহমান। তাছাড়া আমি চাই না, তুমি আমাকে কোনোরকম সন্দেহ করো।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো রহমান— সর্দার, আমাকে ক্ষমা করুন।

রহমান, তুমি যতই সাবধানতার সঙ্গে আমাকে অনুসরণ করছো কিন্তু আমার চোখে তুমি ধূলো দিতে পারোনি। কেন তুমি আমাকে সন্দেহ করো বলোতো?

রহমান জীবনে সর্দারের কাছে এমনভাবে কোনোদিন অপদস্থ হয়নি, আজ যেন সে একেবারে মাটিতে মিশে গেলো।

বনহুরের গলার আওয়াজ নরম হয়ে এসেছে, বুঝতে পারলো রহমান সর্দার তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তবু সে চোখ তুলতে পারছিলো না।

বলবো আবার বনহুর— আমি প্রথমই বলেছি, সব তোমাকে পরে বলবো। যাও, তৈরি হয়ে নাও, সন্ধ্যার পূর্বেই বের হবো।

রহমান যেন এ যাত্রা বেঁচে গেলো, তাড়াতাড়ি সরে পড়লো সে বনহুরের সম্মুখ থেকে।

❑

বনহুর আর রহমান ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। কোচওয়ান বললো— আপনারা এখানে কি করবেন স্যার? এ জায়গা মোটেই ভাল নয়। তাছাড়া আপনারা সন্ধ্যার আগে এখান থেকে ফিরতেও পারবে না। কারণ একটু পরে সব যানবাহন বন্ধ হয়ে যাবে।

বনহুর পকেট থেকে টাকা বের করে কোচওয়ানের হাতে দিয়ে বললো— আমাদের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না ভাই। এবার তুমি যেতে পারো।

কোচওয়ান গাড়ি নিয়ে চলে গেলো।

সন্ধ্যা হবার এখনও বেশ কিছু সময় বাকি আছে। বনহুর আর রহমান এখন যে জায়গায় নেমে দাঁড়ালো এটা মরিলা দ্বীপের বনাঞ্চলের এক অংশ। পথের ওপাশেই ঘন জঙ্গল। এই পথেই বনহুর আর রহমান প্রথমদিন একটা মুন্ডহীন নরদেহের সঙ্গে হোঁচট খেয়েছিলো। আজ আর দেহটা পথে পড়ে নেই, হয়তো পুলিশ মহল লাশটাকে সরিয়ে ফেলেছে, নয় শিয়াল-কুকুরে ভক্ষণ করেছে।

রহমান বললো—সর্দার, ঐ দেখুন একটা লোক এগিয়ে আসছে।

বনহুর কিছুমাত্র অবাক না হয়ে বললো— হয়তো কোনো পথচারী হবে। কিন্তু বেচারীর এই শেষ সূর্যাস্ত।

তার মানে।

মানে কাপালিক হস্তে মরবে।

সর্দার!

হাঁ, আমি জানি, এই মুহূর্তে সে আর ফিরে যেতে পারবে না এখান থেকে।

সর্দার আমরা-------

আমাদেরও আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

তাহলে...

কাপালিক-হস্তে মৃত্যুও ঘটতে পারে রহমান। কিন্তু যাতে মরতে না হয় সেই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। লোকটা আসছে এদিকেই, না?

হাঁ সর্দার। ওকেও আমরা সঙ্গে নিতে পারি কি?

না রহমান, ওটা কাপালিকের আজকের শিকার।

সর্দার!

এসো আমার সঙ্গে, লোকটা যেন আমাদের দেখে না ফেলে, বুঝলে? এসো, ঐ মোটা গাছটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ো।

বনহুর আর রহমান পথের ধারে বড় একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

লোকটা একটি থলে হাতে এগিয়ে আসছে। লোকটার চোখমুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না তবুও বেশ বুঝা যাচ্ছে, সে অত্যন্ত ভড়কে গেছে। চারিদিকে ভীত নজরে তাকাচ্ছে লোকটা আর এগুচ্ছে এক পা দু'পা করে।

বনহুর চাপা কণ্ঠে বললো— রহমান, কাপালিক আজ এরই রক্ত পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে।

সর্দার, আপনি কি করে জানতে পারলেন এই গভীর রহস্যময় কথাটা?

জানতে পেরেছি, নিজের কানেই শুনেছিলাম আজ এই লোকটা আসবে এখানে। আর কাপালিক তাকে হত্যা করে রক্ত পান করবে। বেচারীকে অর্থের লোভ দেখিয়ে এখানে আনা হয়েছে।

বলেন কি সর্দার?

হাঁ, কাপালিক অতি বুদ্ধিমান নররক্ত পানকারী পিশাচ। রহমান, লোকটা সরে গেলেই এই গাছে আমরা চেপে বসবো এবং এখান থেকেই আমি কাপালিককে জীবনের মত রক্ত পানের নেশা থেকে পরিত্রাণ দেবো...আর বিলম্ব করোনা রহমান, চেপে বসো।

রহমান গাছটার গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে আসেনি। রহমান গাছের একটা সুউচ্চ ডালে বসে সর্দারের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

বনহুর ছোটবেলা হতেই গাছে চড়ায় দক্ষ ছিলো, কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না, রহমানের পাশে এসে একটা মোটা ডালে বসলো বনহুর। উভয়ের হস্তেই গুলীভরা রিভলভার।

লোকটা থলে হাতে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে।

রহমান ফিস্ ফিস্ করে বললো— সর্দার, লোকটা ঘাবড়ে গেছে রীতিমত।

হুঁ।

সর্দার, বেচারীকে কাপালিকের কবল থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া যায় না?

যায় না রহমান। কারণ ও মরবার জন্য এসেছে আজ। জানোই তো লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। অল্পক্ষণ স্থির হলে লক্ষ্য করো, সব আজ খোলাসা হয়ে যাবে তোমার কাছে। কাপালিকের মৃতদেহ দেখতে পাবে চোখের সম্মুখে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এলো। বেলা ডুবে গেলো পশ্চিমে।

লোকটাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু ছায়ার মত মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে লোকটার!

লোকটার জন্য বনহুরের মায়া হচ্ছে কিন্তু কোনো উপায় নেই। বাঘ শিকারের জন্য কাঠঘরার মধ্যে যেমন ছাগলছানা রেখে বাঘকে কাঠঘরায় বন্দী করা হয়, তেমনি বনহুর আর রহমান ওঁৎ পেতে বসে রইলো, লোকটাকে দিয়ে তারা শিকার করবে শয়তান নরখাদক কাপালিকটাকে।

বনহুর আর রহমান রিভলভার কোমরের বেল্টে খাপে রেখে পিঠে বাঁধা রাইফেল খুলে নিলো। কারণ রিভলভারের গুলী শেষ পর্যন্ত কাপালিকের নিকটে নাও পৌঁছতে পারে এবং সে কারণেই ওরা রিভলভার রেখে রাইফেলে গুলী ভরে তাক ঠিক করে রইলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমান্বয়ে গাঢ় হয়ে এলো।

গাছে গাছে পাখীর কলরব থেমে এলো একসময়।

গভীর জঙ্গলের ধারে নির্জন পথে বেচারী লোকটা রোদন করতে শুরু করেছে। কোন্‌দিকে পালাবে, কোথায় যাবে, ভেবে পাচ্ছে না।

রহমান বললো— কি ভয়ঙ্কর জায়গা সর্দার!

তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এই কাপালিক।

বনহুরের কথা শেষ হতে না হতে একটা গর্জন শোনা গেলো— হুম্ হুম্ হুম্... ...

লোকটা ছুটে পালাতে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করলো— কে কোথায় আছো বাঁচাও... বাঁচাও...

কালো হাতির মত একটা কিছু এগিয়ে আসছে লোকটার দিকে। লোকটা প্রাণপণ চেষ্টায় উঠিপড়ি করে দিলো দৌড় কিন্তু পারলো না, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে কালো অসুরের মত দেহটা ঝুকে পড়লো লোকটার দেহের উপর। লোকটা গোঁ গোঁ শব্দ করে উঠলো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলী ছুঁড়লো।

রহমানও গুলী ছুঁড়লো তার রাইফেল থেকে।

বনভূমি প্রকম্পিত দেহটা পূর্বের মতই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

পথ এবং জঙ্গলাভূমি বেশ ঘন অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো, তাই স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো না কিছু।

রহমান বললো—সর্দার, কি হলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না?

হতাশ কণ্ঠে বললো বনহুর— আমরা ব্যর্থ হয়েছি!

লোকটার কি হলো সর্দার?

অর্থ গ্রহণ করতে এসে মুন্ডটা দান করে গেলো।

লোকটা মারা পড়েছে তাহলে?

দেখছো না আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

কাপালিক আর আসবে বলে মনে হয় না।

বলাও যায় না, আসতেও পারে। রহমান, আজ সমস্ত রাত আমাদের এখানেই এই গাছের উপরে কাটাতে হবে।

আমার কোনো কষ্ট হবে না সর্দার।

বেশ, তাহলে নিশ্চিন্তে বসো। কাপালিক হত্যায় আজও আমরা ব্যর্থ হলাম।

❑

পরদিন যখন বনহুর আর রহমান ফিরে এলো তখন হোটেলে এক মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে। সবাই বলছে, মিঃ সোহেল আর মিঃ রুহেল গত রাতে কাপালিক হস্তে মৃত্যুবরণ করেছে। শুধু তারাই নয়, হোটেল থেকে আরও একজন নিখোঁজ হয়েছে। কিন্তু এখনও তার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

মিঃ সোহেল আর মিঃ রুহেল হোটেলে পৌঁছতেই মিঃ হাউবার্ড উঠিপড়ি করে ছুটে এলো, তার চোখেমুখে অফুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাস ঝরে পড়ছে। বারবার বনহুর আর রুহেলকে বুকে জাপটে ধরে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো, কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো— কেমন আছে তারা, কোথায় গিয়েছিলো তারা।

বনহুর হেসে বললো— শিকারে গিয়ে হঠাৎ একস্থানে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম, সত্যি এ জন্য আমরা লজ্জিত।

মুখ গম্ভীর করে আদরমাখা কণ্ঠে বললো হাউবার্ড— হঠাৎ যদি কোনো বিপদ ঘটতো তাহলে কি হতো? এমনি তো হোটেলে কাপালিক বেটা বদনামের জয়টিকা পরিয়ে গিয়েছে। আজ আবার তোমরা তিনজন উধাও হয়েছিলে— দু'জন ফিরে এলে, আর একজনের এখনও ফিরে আসার কোনো লক্ষণ দেখছি না।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো— মিঃ হাউবার্ড, আর সে ফিরে আসবে বলে মনে হয় না।

এ তুমি কি বলছো সোহেল?

হাঁ, সত্যি বলছি।

হাউবার্ড মাথায় হাত দিয়ে একটা সোফায় ধপ্ করে বসে পড়লো, তারপর আপন মনেই বলে উঠলো— লোকগুলো বেহায়াপনা করে হোটেলের বাইরে যাবে আর বিপদে পড়বে—বদনাম হবে আমার হোটেলের। হায় হায়, কাপালিক বেটার জন্য আমার হোটেলের চরম দুর্দশা হবে দেখছি। শোন সোহেল, তোমাদের কাছে অনুরোধ, তোমরা আর কখনও বাইরে যাবে না! হাঁ, আরও একটা কথা শোন, আমি এখন থেকে তোমাদের দু'জনকে 'তুমি' বলবো, কেমন?

বনহুর হেসে বললো— নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এতে আমরা খুশিই হবো। কারণ আপনি আমাদের পিতার বয়সী কিনা।

ঠিক বলেছো, তোমরা আমার সন্তানের মত... ...

সেই কারণেই তো আমাদের জন্য আপনার দরদের সীমা নেই।

তাতো বুঝতেই পারছো। সত্যি, তোমাদের এক মুহূর্ত না দেখলে মনটা আমার খা খা করে।

বনহুর ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো— আজ আপনার বুকের জ্বালাটা কেমন আছে মিঃ হাউবার্ড?

মিঃ হাউবার্ড বুকে হাত বুলিয়ে গদগদ কণ্ঠে বললো— অনেকটা ভাল আজ।

বনহুর ছোট একটি শব্দ করলো— হুঁ।

এবার বনহুর আর রহমান নিজেদের ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। সমস্ত রাত অনিদ্রায় কেটেছে তাদের, কাজেই শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত-অবসাদ মনে হচ্ছে।

বনহুর বেশ করে স্নান সেরে নিয়ে কিছুটা খেয়ে শুয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙ্গলো প্রায় বেলা দুটো-আড়াইটায়।

রহমান ঠিকভাবে ঘুমাতে পারেনি, অবশ্য ঘুমোতে চাইলেও ঘুম তার চোখে আসে না। বিদেশ জায়গা, তাছাড়া সর্বক্ষণ বিপদ আপদের আশঙ্কা রয়েছে— কখন সর্দারের উপর কোন্ বিপদ ঘটে, এটাই তার একমাত্র চিন্তা। সর্দার জেগে থাকলে তার জন্য একটুও ভয় বা আশঙ্কা নেই। কারণ সে জানে, সর্দার তার চেয়ে অনেক জ্ঞান রাখে এবং শক্তিও তার চেয়ে অনেক বেশি।

বনহুর যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন রহমান সজাগ প্রহরীর মত পাহারারত থাকে, এটা তার আজকের অভ্যাস নয়—বহুদিনের। কাজেই আজও বনহুর যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলো ততক্ষণ রহমান ঘুমায়নি।

রহমানের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। বার বার হাই তুলছে সে।

বনহুর বললো— রহমান তুমি ঘুমাওনি?

রহমান নীরব রইলো।

বনহুর বুঝতে পারলো, রহমান অন্যান্য দিনের মত আজও ঘুমায়নি। বললো বনহুর— যাও ঘুমিয়ে নাও রহমান, আজ রাতেও হয়তো ঘুমাবার সময় পাবে না।

রহমান চলে গেলো নিজের ক্যাবিনে।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লো।

মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। এবার বনহুর ড্রেস পরে সজ্জিত হয়ে নিলো। হোটেলের ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকালো বনহুর নিজের চেহারার দিকে। সত্যি, তাকে অপূর্ব সুন্দর লাগছে! একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে।

এলিনের দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদু টোকা দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো, বেরিয়ে এলো এলিন। শরীরে তার স্নানের ড্রেস। এলিন বোধ হয় বাথরুমে ছিলো, দরজায় শব্দ পেয়ে চলে এসেছে সেই ভাবেই।

এলিনের সুঠাম দেহের প্রায় সমস্ত অংশই খোলা রয়েছে, সামান্য আবরণ দ্বারা দেহের কিছু কিছু অংশ ঢাকা। বনহুর চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না, নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুর এলিনের যৌবনভরা সুঠাম দেহটার দিকে। পরক্ষণেই হুঁশ্ হলো, এমন সময় আসাটা বোধ হয় সমীচীন হয়নি তার।

বনহুর দৃষ্টি নত করে নিয়ে বললো— ক্ষমা করো এলিন, আমি ভুল করে এসে গেছি, এখনই যাই...

এলিনের দু'চোখে তখন মায়াময় চাহনি, দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো এলিন বনহুরের হাত দু'খানা, তারপর বললো— এসো...ভিতরে এসো...

মন্ত্রমুগ্ধের মত বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো।

এলিন বনহুরকে বসিয়ে দিলো একটা সোফায়। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো তার গলা। বনহুর ধীরে ধীরে এলিনের হাত দু'খানা সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

এলিন বললো— মিঃ সোহেল, কি খাবেন বলুনতো?

বনহুর দাঁড়িয়েই বললো— তোমার যা খুশি আমাকে দিতে পারো।

এলিন পাশের কামরায় প্রবেশ করলো, একটা বিলেতী মদের বোতল আর গেলাস্ হাতে ফিরে এলো।

বনহুর হেসে বললো— স্নান সেরে এসো, আমি বসছি এলিন।

না, তোমাকে রেখে আমি যাবো না...এলিন বনহুরকে এই প্রথম 'তুমি' বলে সম্বোধন করলো।

বনহুর এলিনের হাত থেকে মদের বোতল আর গেলাসটা নিয়ে টেবিলে রাখলো, তারপর টেপ্‌রেকর্ড চালু করে দিলো।

এলিন এবার যাদুমন্ত্রের মত বাজনার তালে তালে ব্যালে নৃত্য শুরু করলো।

বনহুর গেলাসে খানিকটা বিলেতী মদ ঢেলে এগিয়ে এলো এলিনের পাশে।

এলিন তখন সুন্দর ভঙ্গীমায় নাচতে শুরু করেছে, নাচের তালে তালে দুলছে তার দেহ-পল্লবখানা। সাধারণত এলিন বলড্যান্স আর ব্যালে নৃত্যে পারদর্শী ছিলো।

বনহুরের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে গলায় ঢেলে দিলো ঢক্ করে, তারপর গেলাসটা ছুঁড়ে দিলো বনহুরের দিকে।

বনহুর গেলাসটা নিয়ে টেবিলে রাখলো।

এলিন নেচে চলেছে।

অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গীমায় নাচছে সে। যদিও এলিনের দেহে তখন স্নানের ড্রেস তবু সে কোনো সঙ্কোচ বা দ্বিধা করছে না। কারণ এসব পোশাক তাদের কাছে মোটেই আপত্তিজনক নয়।

বনহুর পুনরায় আর এক গেলাস মদ ঢেলে এগিয়ে ধরে এলিনের সামনে— নাও এলিন, পান করো।

এলিন তখনও বাজনার তালে তালে হাত দু'খানা আর মাজাটা বিশেষ ভঙ্গীমায় দোলাচ্ছে।

সত্যিই আজ বনহুর যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, এলিনের দিক হতে সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না সে।

গেলাসটা এলিন গ্রহণ করলো বনহুরের হাত থেকে, তারপর এক নিশ্বাসে পান করে গেলাসটা ছুঁড়ে দিলো টেবিলটার দিকে।

বনহুর গেলাসটা ধরবার পূর্বেই মেঝেতে পড়ে সশব্দে ভেঙ্গে গেলো খান খান হয়ে।

খিল খিল করে হেসে উঠলো এলিন।

বনহুর বুঝতে পারলো—নেশা ধরে গেছে এলিনের। সে এবার ধরে ফেললো এলিনকে।

এলিনের দেহটা তখন নাচের তালে তালে টলছিলো। না জানি কোন্ মুহূর্তে পড়ে যাবে ভূতলে। বনহুর এলিনকে ধরে ফেলতেই এলিন জড়িয়ে ধরলো বনহুরকে। বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে বললো—আর নাচতে পারছি না বন্ধু---

বনহুরের হাতের উপর ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ছে এলিনের দেহটা।

বনহুর এলিনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো—আর নাচবে না এলিন?

হাঁ, আরও নাচবো। আরও নাচবো আমি---

রহমান কখন যে এসে পড়েছিলো নিচে, বাজনার আওয়াজ পেয়ে সোজা সে এলিনের ক্যাবিনের দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ রহমানের দৃষ্টি চলে যায় ভিতরে।

বনহুর বা এলিন দরজা বন্ধ করে দেবার কথা সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিলো, তাই রহমানের দৃষ্টিপথে কোনো বাধা পড়ে না। তার সর্দারের হাতের উপর এলিনের নগ্নদেহ—রহমান মুহূর্তে সরে আসে সেখান হতে।

ফিরে আসে রহমান নিজের কামরায়। কিছুতেই রহমান নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আজ যা দেখলো এটা কি সত্য? সত্যি কি তার সর্দার এতো অধপতনে গেছে। যত ভাবছে রহমান ততই যেন একেবারে রাগে-ক্ষোভে অধীর হয়ে পড়ছে সে। নিশ্চয়ই ঐ এলিন তার সর্দারকে যাদু করেছে---

রহমান যখন বনহুরকে নিয়ে গভীরভাবে ভেবে চলেছে তখন বনহুর এলিনকে প্রশ্ন করে চলেছে—এলিন, আমি তোমার, বলো কি চাও তুমি?

এলিনের জড়িত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হয়—সোহেল, আমি শুধু তোমাকে চাই। শুধু তোমাকে তবে বলো কে, কে সেই কাপালিক?

না না, ও কথা আমি বলবো না।

তাহলে আমিও চলে যাবো তোমার কাছ থেকে। আর কোনোদিন আসবো না। বলো এলিন, কে সেই নর রক্তপিপাসু কাপালিক?

আমি জানি না।

তুমি জানো। তুমি জানো এলিন কে সেই নরঘাতক?

আমি জানলেও বলবো না। সে আমাকে হত্যা করবে।

তোমাকে আমি রক্ষা করবো এলিন।

পারবে না। আমাকে তার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না সোহেল।

এলিন, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে বাঁচাবো।

সত্যি, পারবে আমাকে বাঁচাতে? যদি পারো তাহলে---

কথা শেষ হয় না এলিনের, পিছনে এলিনের বাবা হাউবার্ড এসে দাঁড়ালো—তোমরা এখানে।

বনহুর তাড়াতাড়ি এলিনকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ হাউবার্ডের আগমনে চমকে উঠেছে বনহুর।

এলিন তো মদের নেশায় চুর হয়ে পড়েছে।

হাউবার্ড বললো—ওকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দাও। নাহলে এক্ষুণি পড়ে যাবে।

বনহুর নির্বিকারভাবে হাউবার্ডের আদেশ পালন করলো। যদিও হাউবার্ডের সম্মুখে এলিনের নগ্নদেহটা স্পর্শ করতে বাধছিলো তার তবু কতকটা বাধ্য হয়েই এলিনকে ধরে শুইয়ে দিলো বিছানায়।

হাউবার্ড ততক্ষণে এলিনের ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেছে বাইরে। হোটেলের সিঁড়িতে শোনা গেলো তার পায়ের শব্দ। বনহুর এলিনের দিকে তাকিয়ে দেখলো ওর চোখ দুটো মুদে গেছে।